নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা]   [মাঘ, ১৩২২ সাল

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ

সমাজ যে ঠিক জৈবধর্ম্মবিশিষ্ট একথা বলা যায় না। কিন্তু সাদৃশ্য যে অনেকদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জীবদেহের যেমন উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস আছে, সমাজেরও তেমনই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন জীব-দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংসের অনুকূল বা প্রতিকূল,—সমাজও তেমনই তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি বা ধ্বংসের জন্য কতকগুলি অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। পরিবর্ত্তনশীল নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে জীবদেহ যেমন নিয়ত চেষ্টা করে,—সমাজের মধ্যেও সেই ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই চেষ্টার অক্ষমতায় জীবদেহের যেমন মৃত্যু,—সমাজেরও তাহাই। কোন জীবের মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে সে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন, শারীরিক বা মানসিক শক্তির বিশেষরূপ হ্রাস প্রভৃতি কতকগুলি মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। একটা জাতির ধ্বংস হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ কতকগুলি লক্ষণ দেখা

যায়। কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে সেই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে থাকিলে তাহার ধ্বংস যে অদূরবর্ত্তী তাহা মনে করা যাইতে পারে।

কারণ ও লক্ষণ লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে। আমি সে সকল তর্কের মধ্যে যাইতেছি না। যে সকল আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য শক্তিসমূহ কোনও জাতিকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায় তাহাদিগকেই আমি জাতীয় ধ্বংসের কারণ বলিতেছি। আর সেই কারণসমূহের যে সকল বহিঃপ্রকাশ—জাতীয় জীবনের উপর তাহাদের প্রভাবের যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই জাতীয় ধ্বংসের লক্ষণ বলিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জাতীয় ধ্বংসের কতকগুলি লক্ষণেরই আলোচনা করিব।

১। লোকসংখ্যা—স্বাভাবিক অবস্থায় জাতিসকলের মধ্যে লোকসংখ্যা সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। কোন জাতি যখন উন্নতির মুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহার লোকসংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমনকি একপুরুষের মধ্যেই দ্বিগুণ হইতে পারে। (১) আমেরিকায় ইউরোপীয় জাতিদের উপনিবেশ স্থাপনের পরে তাহাদের লোকসংখ্যা প্রতি পঁচিশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইতে দেখা গিয়াছিল। পক্ষান্তরে যে জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে বসিয়াছে, তাহার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেই থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা এত দ্রুতগতিতে কমিয়া সেই জাতি ধ্বংস হইয়া যায় যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপীয়েরা টাসমানিয়া অধিকার করিলে তাহার আদিম অধিবাসীরা অতি দ্রুত গতিতে ধ্বংস পাইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর ছিল না। নিউজিল্যাণ্ডের মেওয়ারীদের মধ্যেও ইহাই দেখা গিয়াছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা,

(১) Gidding's Sociology.

১৮৪৪-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেওয়ারীরা শতকরা ১৯.৪২ জন কমিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৫৩৭০০;— আর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আর চৌদ্দ বৎসর পরে, লোকসংখ্যা কমিয়া মাত্র ৩৬,৩৫৯ হইয়াছিল; অর্থাৎ এই চৌদ্দ বৎসরে লোক-সংখ্যা শতকরা ৩২.২৯ জন হিসাবে কমিয়াছিল। সাণ্ডউইচের আদিম অধিবাসীদের অবস্থাও ঐরূপ হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০০০; আর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়া-ছিল ১৪২০৫০; ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই মাত্র ৫১,৫৩১! ১৮৩২-১৮৭২ এই চল্লিশ বৎসরে উহাদের লোকসংখ্যা প্রায় শত-করা ৬৮ জন কমিয়াছিল! (২)

লোকসংখ্যা এইরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস হওয়া আসন্ন ধ্বংসেরই লক্ষণ। কিন্তু ধ্বংসের লক্ষণ অন্যরূপেও দেখা দিতে পারে—যদিও তাহা এত দ্রুতধ্বংস সূচনা করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় লোকসংখ্যা যে কেবল বাড়েই তাহা নহে, বৃদ্ধির হারও প্রায়ই বাড়িয়া চলে। কোন কোন স্থলে বা দীর্ঘকাল ধরিয়া একরূপই থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং যদি দেখা যায় যে কোন জাতির মধ্যে বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, তবে সেটা সুলক্ষণ নহে বুঝিতে হইবে। যে কারণে বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে, তাহারই ফলে শেষে বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া লোকসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসের দিকেই যাইতে থাকে। দেশব্যাপী সাময়িক দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর জন্যও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার কিয়ৎ-কালের জন্য কমিতে পারে। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর ফলে প্রথমতঃ বিবাহসংখ্যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় কম হয়; দ্বিতীয়তঃ পিতা-মাতার জীবনীশক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়; আর এই সকলের সমবায়ে জন্মের হার ও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। ইহা সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু যদি দেখা যায়

(২) Darwin—The Descent of man.

যে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা জাতির বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া যাই-তেছে, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী না থাকিলেও বৃদ্ধির হার উপরের দিকে যাইতেছে না—তবেই তাহা আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। গত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের ও আয়র্লণ্ডের বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়িয়া আসে নাই, প্রায় একরূপই আছে। কিন্তু তবু সেখানে অনেকে ইহাকে জাতীয় জীবনের ধ্বংস বা আত্মহত্যাসূচক মনে করিতেছেন। (৩) কিছুকাল হইতে ফ্রান্সের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। ইহাতে সেখানকার রাষ্ট্রনায়কগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিবাহ-সংখ্যা ও জন্মসংখ্যা বাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। (৪) ১৮৭২ খৃঃ হইতে ১৯০১ খৃঃ পর্য্যন্ত—ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলাদেশেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমিতে-ছিল। ইহা একটা আশঙ্কার কারণ বলিয়া কেহ কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাঙ্গলাদেশের বৃদ্ধির হার। (শতকরা)

১৮৭২—৮১	১৮৮১—৯১	১৮৯১—১৯০১
১১'৫	৭'৩	৫'১

সমগ্র ভারতবর্ষেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে দেখা যায়; যথা—

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
২৩'১	১৩'১	১২'৪	৭

আবার হিন্দু-সমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকায়স্থাদি উচ্চবর্ণের ভিতর এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বেশী কমিতেছে তাহার প্রমাণ

(৩) The Empire and the Birth-rate—a lecture by C. V. Drysdale D. Sc. (1914).

(৪) Ibid.

আমরা সেন্সাসে পাই। ভবিষ্যতে সে বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাঙ্গলাদেশে মুসলমানদের তুলনায় সমগ্র হিন্দুদের বৃদ্ধির হার অতি কম দেখা যাইতেছে। গত দশ বৎসরে (১৯০১—১৯১১) হিন্দুর তুলনায় মুসলমানেরা তিন গুণ পরিমাণে বাড়িয়াছে! (৫)

২। জন্মমৃত্যু—লোকসংখ্যার হ্রাস বা লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হারের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার কম অথবা মৃত্যুর হার বেশী হইতে দেখা যায়। জন্মের হার কমিলেই যে তাহা দুর্লক্ষণ, তাহা নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল দেশসমূহে জন্মের হার অপেক্ষাকৃত কমিয়াই যাইতেছে; এবং আধুনিক অনেক পণ্ডিত তাহাকে সমাজের ব্যষ্টিগত উন্নতির সহকারী ফল বলিয়াই মনে করিতেছেন। (৬) কিন্তু সেই সকল স্থানে আবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হারও কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহার ফলে বৃদ্ধি খুব দ্রুত না হইলেও স্থির ও নিশ্চিত ভাবে হইতেছে। কিন্তু জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার যদি বেশী হয়, অথবা জন্মের হার যদি ক্রমাগত কমিতে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর হার প্রায় একরূপই থাকে, তবে তাহা সুলক্ষণ নহে। ফলতঃ মৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়াটাই বেশী ভয়ের কারণ। আর জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার ক্রমাগত বেশী হইতে থাকিলেই লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। অনেকে মনে করেন আমাদের ভারতবর্ষে ইউরোপের তুলনায় জন্মসংখ্যা খুব বেশী। সুতরাং আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ আসিতেই পারে না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে,

---

(৫) See the Resolution of the Bengal Government on the Census Report of 1911.

(৬) The Birth-rate diminishes as the rate of individual evolution increases—Gidding's Sociology, P. 337.

ইউরোপে জন্মের হার যেমন অপেক্ষাকৃত কম, মৃত্যুর হারও সেইরূপ কম। কিন্তু ভারতবর্ষে জন্মের হার যেমন বেশী, মৃত্যুর হারও তেমনই বেশী। আর তাহার ফলে মোটের উপরে ইউরোপীয় বৃদ্ধির হার হইতে ভারতের বৃদ্ধির হার কম। ভারতবর্ষে জন্মের হার প্রতি হাজারে ৪৮ জন (১৯০১), কিন্তু পক্ষান্তরে মৃত্যুর হারও খুব বেশী, হাজার-করা প্রায় ৪১ জন। (৭) Statesman's Year Bookএ দেখা যায় যে ১৯০৮-১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের জন্মের হার ছিল হাজার-করা ৩৭·৭, কিন্তু মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ৩৪·৩। সুতরাং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার সমগ্র ভারতবর্ষে মোটের উপর ইউরোপ প্রভৃতি দেশের তুলনায় কমই হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ডের জন্মের হার গড়ে হাজার-করা ২৫।২৬ জন, কিন্তু মৃত্যুর হারও আবার প্রতি হাজারে মাত্র ১৩ জন (১৯১১)। (৮) ১৮৭৩ খৃঃ এই মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে হাজার-করা গড়ে ২২ জন ছিল। আর ১৯১১ সালে ইহা কমিয়া ১৩ জনে দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ জন আছে—আর ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৮৬৮-১৯১১ সাল পর্য্যন্ত গড়ে মাত্র ৪·৩ জন। (৯) বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দুইএকটি দেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মের হার ছিল শতকরা ৪০ জন—এখন কমিয়া হইয়াছে শতকরা ২৬।২৭ জন (১৯১১)। কিন্তু মৃত্যুর হারও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা

---

(৭) Mr. Bain in Indian Census Report (1901).

(৮) Dr. Drysdale—The Empire and the Birth-rate (1914).

(৯) Dr. Drysdalo—The Empire and the Birth-rate (1914).

৯.৫ জন। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা কম মৃত্যুর হার। সুতরাং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ঐ সকল দেশে কম নহে। অষ্ট্রেলিয়াতে উহা শতকরা ৫০ জন ও নিউজিল্যাণ্ডে শতকরা ১৬ জন। কানাডার অণ্টেরিওতে ১৮৮০-১৮৯৫ খৃঃ-এর মধ্যে জন্মের হার ছিল হাজার-করা ২২—১৯ জন, আর মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ১০ জন। ১৮৯৫-১৯১১ খৃঃ-এর মধ্যে ঐ সকল দেশে জন্মের হার ছিল হাজার-করা ২৫ জন—আর মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ১৪ জন। (১০) ১৯০৮ সালের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষেরই সকলের অপেক্ষা কম—মাত্র শতকরা ৩.৪ জন। কেহ কেহ বলেন এ বিষয়ে একা ভারতবর্ষই সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির হারের গড়কে কমাইয়া দিতেছে। (১১)

সমাজতত্ত্ববিৎ গিডিংস জন্মমৃত্যু সংখ্যার অনুপাতে জীবনীশক্তি নির্দ্ধারণ করিয়া লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন ;—

প্রথম শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী এবং মৃত্যুর হার কম। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হারও কম, মৃত্যুর হারও কম। ইহারা জীবনীশক্তি হিসাবে মধ্যম শ্রেণী।

তৃতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী আবার মৃত্যুর হারও বেশী। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বনিম্নশ্রেণী। (১২)

গিডিংসএর এই প্রণালী ধরিয়া যদি আমরা বিভিন্ন দেশের শ্রেণীবিভাগ করি, তবে ভারতবর্ষ যে জীবনীশক্তি অনুসারে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে স্থান পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং

---

(১০) Ibid.

(১১) Dr. Drysdale—The Empire and the Birth-rate (1914)

(১২) Gidding's Sociology, P. 125.

অত্যধিক জন্মেরও সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মৃত্যুর হার যে বিশেষ আশার কথা নহে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কত বেশী লোক জন্মগ্রহণ করে, উপর উপর তাহাই দেখিয়া খুসী হইলে চলিবে না; কত লোক জন্মের পর টিকিয়া থাকে তাহাই খতাইয়া দেখিতে হইবে।

৩। স্ত্রী-সংখ্যা ও উৎপাদিকা শক্তি—ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবার সময়ে সমাজে স্ত্রীলোকদের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তির সমধিক-রূপে হ্রাস হইতে দেখা যায় (১৩)। তাহার ফলে জন্মের হার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে নানা কারণে উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে পারে। ম্যাল্‌থাস প্রশান্ত মহাসাগরের টাহিটিয়ান প্রভৃতি দ্বীপবাসী অসভ্যদের জীবন-প্রণালী আলোচনা করিয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যধিক ব্যভিচার ও দুর্নীতিই তাহাদের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসের কারণ বলিয়াছেন। (১৪) কিন্তু সামাজিক প্রণালী বা নীতি প্রভৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়াও ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়। ইউরোপীয়দের দ্বারা বিজিত দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ইহাই দেখা গিয়াছিল। সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাহ্রাস ও অবনতির একটা লক্ষণ। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইতেই দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই এইরূপ। সমগ্র ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম—প্রতি এক হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৫৪ জন স্ত্রীলোক। পাঞ্জাব, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম।

---

(১৩) Darwin—The Descent of man.

(১৪) Malthus on Population.

১৯১১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় যে, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের লোক-সংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনুপাত ক্রমেই কমিয়া যাই-তেছে ;—

স্ত্রীলোকের সংখ্যা (হাজার-করা)—

	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
বাঙ্গলা—	৯৪৫	৯৬০	৯৭৩	৯৯৪
পাঞ্জাব—	৮১৭	৮৫৪	৮৫০	৮৪৪

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা কম হইলে বিবাহসংখ্যা কম হয়,—সুতরাং জন্মসংখ্যাও কম হয়। আবার সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীসংখ্যা কম হইলে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষেরও আত্যন্তিক বৃদ্ধি হয় ;—ইহার ফলেও জন্মসংখ্যা কমিয়া যায়। সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইলে তাহা সেই সমাজের জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাও সূচনা করে। পাঞ্জাবে ও বাঙ্গলাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। আর হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধির হারও বেশী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জানা যায় যে, বাঙ্গলাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরা তিন গুণ পরিমাণ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪। শিশুমৃত্যু—সাধারণ মৃত্যুর হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিশুমৃত্যুর হার বাড়িতে দেখা যায়। শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে যার পর নাই আশঙ্কার কথা। ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার দেখা গিয়াছে। (১৫) সমাজ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সুস্থ ও সবল শিশুর জন্ম হয়, মৃত্যুসংখ্যা কম হইতে থাকে এবং লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ সমাজে রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুই বেশী জন্মগ্রহণ করে। জীবনসংগ্রামে টিকিতে না

(১৫) Darwin—The Descent of man.

পারিয়া তাহাদের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ফলে সংখ্যায় শিশুরা বেশী মরিতে থাকে এবং লোকসংখ্যা কম হইতে থাকে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা ঘোরতর আশঙ্কার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। এবারকার সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে সমগ্র বঙ্গে প্রতি পাঁচজনে একজন করিয়া শিশু মরে;—আর কলিকাতা সহরে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ত্রিশ জন। দেখা যায় ইংলণ্ডে ১৯০০ সাল হইতে শিশু-মৃত্যুর হার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ আশার কোন কারণ দেখিতেছি না। (১৬) রাজপুরুষেরা বলেন—এ দেশীয় লোকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, নানা-প্রকার কু প্রথা, স্বাস্থ্যতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, শ্রমজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্যই ইহার কারণ। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে জাতীয় জীবনীশক্তির মূলে যাইতে হইবে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি কতকটা সাময়িক কারণ বটে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা জাতির জীবনীশক্তি যখন কম হইয়া যায়, তখনই তাহার মধ্যে এইরূপ পরিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার দেখা যাইয়া থাকে। দারিদ্র্য ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি সেই জীবনীশক্তি-হ্রাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার এদেশে কেবল সাময়িক নহে; ইহা বহুদিন হইতে দেখা দিয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ নিরূপণ করিতে হইলে, জাতীয় জীবনের গোড়ায় যাইতে হইবে। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দুই চারিটা মামুলী বচন আওড়াইয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না। একটা বৃক্ষের অঙ্কুরাবস্থাতেই তাহা যদি মুষড়াইয়া যায়, তবে তাহার ধ্বংস যেমন অনিবার্য্য, সেইরূপ

(১৬) Dr. Drysdale—The Empire and the Birth-rate(1914).

যে সমাজে শিশুদিগের মধ্যেই মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বেশী হইতে থাকে, তাহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আশাজনক নহে।

৫। দুর্ভিক্ষ—দেশব্যাপী ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হওয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে বড় দুর্লক্ষণ। জলবায়ুর অবস্থা ও নানা আকস্মিক কারণের ফলে উন্নতিশীল জাতির মধ্যেও কচিৎ দুই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বটে। কিন্তু যদি কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ হইতে দেখা যায়, তবে সেই জাতির মধ্যে দারিদ্র্য যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, জীবনযুদ্ধে ক্রমেই যে তাহারা পিছাইয়া পড়িতেছে—ইহাই অনুমান করিতে হয়। অতীতে অনেক ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আদিম অসভ্য বর্ব্বরাবস্থায় মানুষ যখন বনে জঙ্গলে থাকে, তখন তাহার মধ্যে এইরূপ দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন হইতে দেখা যায়। লোকসংখ্যার হিসাবে খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যই তাহার কারণ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে, অনাহারের ভীষণ যন্ত্রণায় শত শত লোক মরিয়া যায়—এমন কি ছোট বড় অনেক জাতিও ধ্বংস হইয়া যায়। (১৭) অপেক্ষাকৃত সভ্য অবস্থাতেও মানুষ ইহার হাত হইতে সকল সময়ে পরিত্রাণ পায় না। ফলতঃ কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল অবস্থাতেই, যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টিকিতে পারে, তাহারাই বাঁচে,—যাহারা অক্ষম তাহারা মরিয়া যায়। আর কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ হইলে, জীবন-যুদ্ধে সেই জাতির ক্রমবিবর্দ্ধমান অক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা—শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে ইহাই মনে করিতে হয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যেরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে, তাহা খুব আশা-প্রদ নহে। ধরিতে গেলে গড়ে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে। ১৮৭৬, ১৮৯৯,

(১৭) Malthus on Population.

ও ১৯০১ খৃঃ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইতে দেখা গিয়াছে। আর ইহা যে ভারতবর্ষের চিরদারিদ্র্যের সূচনা করিতেছে তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। যে দেশের অধিকাংশ লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, যে দেশের লোকের বাৎসরিক আয় গড়ে পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা মাত্র, তাহার দারিদ্র্যের কথা না তোলাই ভাল। চির-দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে দেশের রাজস্ব ও বাণিজ্য-নীতির উপরেও নির্ভর করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ আরও গভীরতর; তাহা আমরা পরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। চির-দারিদ্র্য ও চির-দুর্ভিক্ষ পরস্পরের সহোদর; আর উভয়েই ধ্বংসের অগ্রদূত।

৬। মহামারী—ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ন্যায় ঘন ঘন মহামারীর প্রাদুর্ভাবও তেমনই জাতীয় জীবনের পক্ষে অমঙ্গলের সূচনা করে। সুস্থ সবল ব্যক্তির ন্যায় উন্নতিশীল জাতির মধ্যেও ব্যাধি ও মহামারী বিরল দেখা যায়। যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহেই যেমন নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ধ্বংসোন্মুখ জাতি-দের মধ্যেও তেমনই নানা ব্যাধি মজ্জাগত হইয়া পড়ে—নানা নূতন নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে ঠিক ইহাই দেখা গিয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সমস্ত গ্রীকজাতি তিলে তিলে লুপ্ত হইবার পথে গিয়াছিল। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তি ধীরে ধীরে ইহাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল;—

"Gradually the Greeks lost their brilliance, which had been as the bright freshness of the youth. This is painfully obvious in their literature, if not in other forms of art. Their initiation vanished, they ceased to create and began to comment. Patriotism with rare exception, became an empty name, for few had the spirit and energy to translate into action one's

duty to the State. Vacillation, indecision, fitful outburst of unhealthy activity followed by cowardly depression, selfish cruelty and criminal weakness are characteristic of the public life of Greece from the struggle with Macedonia to the final conquest by the arms of Rome. No one can fail to be struck by the marked difference between the period from Marathon to the Peloponnesian War and the period from Alexander to Mummians". (১৮)

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান মিঃ ক্লাইন্ অল্পদিন পূর্ব্বে East and West পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বর্ব্বর-বিজিত ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন রোমকজাতির মধ্যেও ঠিক এইরূপ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আর প্রাচীন গ্রীস ও রোমের এই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আমাদের বাঙ্গলার (১৯) সর্ব্বধ্বংসিনী ম্যালেরিয়ার যে যথেষ্ট সাদৃশ্যই আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীসের ন্যায় এখানেও ম্যালেরিয়া-পীড়িত অধিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পরিশ্রম-পটুতা কর্ম্মের উৎসাহ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; আলস্য, নিরাশা, জীবনে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। ইহারই মধ্যে কত গ্রাম নগর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশান হইয়া গিয়াছে, বনজঙ্গলে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সীমা নাই। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রাণত্যাগ করিতেছে;—যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে তাহারাও জীবন্মৃতবৎ অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঊর্ণনাভ যেমন তাহার জাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে

(১৮) Joane's Greek History and Malaria, (1909).

(১৯) বাঙ্গলার কেন—আজকাল সমস্ত ভারতেরও বলা যাইতে পারে।

পতঙ্গকে মৃত্যুমুখে লইয়া যায়, এই ভীষণ ম্যালেরিয়া আজ তেমনই সমস্ত বঙ্গদেশে—এমন কি ভারতবর্ষময়—তাহার জাল ধীরে ধীরে বিস্তার করিতেছে। এই জালের মধ্যে এই হতভাগ্য জাতি যে কবে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? আর শুধুই কি ম্যালেরিয়া? প্লেগ, কলেরা ও আরও নূতন নূতন ব্যাধি ক্রমেই এই দুর্ভাগ্য দেশে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। প্লেগ, কলেরা ও ম্যালেরিয়া ইউরোপেও অনেক স্থলে দুই এক বার হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল দেশের লোকেরা সেগুলিকে দূর করিয়া দিয়া আপনাদের দেশকে নিরাপদ করিয়াছে। কিন্তু এই দেশে একবার যে রোগ প্রবেশ করিতেছে, তাহা আর যাইতেছে না। অন্তঃপ্রবিষ্ট কীটের ন্যায় ক্রমে তাহারা জাতীয় শরীরের শিরা, উপশিরা ও যন্ত্রাদি আক্রমণ করিয়া জীবনীশক্তি লোপ করিয়া দিতেছে। কোন জীবদেহের যখন জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে থাকে, তখন তাহার বাহিরের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি আর পূর্ব্বের মত থাকে না,—যেটুকু থাকে তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। পূর্ব্বপ্রবিষ্ট রোগ ক্রমেই স্বীয় প্রভাব বেশী করিয়া বিস্তার করিতে থাকে এবং নূতন নূতন নানা রোগও সুবিধা পাইয়া অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে ছাড়ে না। কোন বিশেষ জীবদেহের ন্যায় একটা জাতির পক্ষেও একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

৭। প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাস—কোন জাতি যখন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার শারীরিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও হ্রাস হইতে থাকে। দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে—সেখানেও নানা রোগ ও দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। সমাজেরও মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি আছে;—প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই তত্তৎ স্থানীয়। উন্নতিশীল সমাজে তাহার এই মানসিক শক্তির ক্রমশঃই বিকাশ হইতে থাকে, আর তাহার ফলে সমাজমধ্যে বহু প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিতে

থাকে। পৃথিবীর যেখানেই কোন জাতি উন্নতি করিয়াছে বা করিতেছে সেইখানেই এই নিয়মের ক্রিয়া অব্যাহতভাবে দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি জাতির গোড়ায় অনুসন্ধান করিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যেসকল জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বা অধোগতির পথে গিয়াছে তাহাদের মধ্যে জাতীয় মানসিক শক্তির হ্রাস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হইতে দেখা গিয়াছে;—প্রতিভাশালীর সংখ্যা স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়াছে। প্রাচীনকালের রোম, গ্রীস ও ভারতবর্ষে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। যে দিন রোম অর্দ্ধপৃথিবীর সম্রাট ছিল, তখন তাহার রাজনৈতিক, যোদ্ধা বা ব্যবহারবিদের অভাব ছিল না। সিসিরোর মত বক্তা, সিজারের মত বীর, যাষ্টিনিয়ানের মত ব্যবহারবেত্তার তখনই সম্ভব হইয়াছিল। বর্ব্বর বিজয়ের প্রাক্কালে রোমের সেই পূর্ব্বগৌরবের কি অবশিষ্ট ছিল? যে গ্রীস জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ইউরোপের প্রভাত আলো করিয়াছিল, পতনের সময় তাহার সে জ্যোতিঃ কোথায় নিবিয়া গিয়াছিল! ডেমস্থিনিস, পেরিক্লিস বা সক্রেটিশ তখন কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে কয়জন যথার্থ মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন? কয়জন শঙ্কর, চাণক্য, কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাস ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন?

তাই যখন দেখি যে কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্ম হইতেছে না; যাঁহারা ধর্ম্মে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নূতন ভাব আনয়ন করেন, যাঁহারা তাঁহাদের শক্তির প্রাবল্যে দেশময় আলোড়ন উপস্থিত করেন,—এমন মানুষ কোন জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর বড় একটা দেখা যাইতেছে না—তখন বুঝিতে হইবে সে জাতি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অধোগতির দিকে যাইবার মুখেই দাঁড়াইয়াছে। তাহার মানসিক শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যে প্রখর বুদ্ধিবলে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে আপনার

সামঞ্জস্য বিধানের নব নব উপায় সমাজ প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করে, তাহার সে বুদ্ধি মলিন হইয়া যাইতেছে;—ধরাপৃষ্ঠে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আধুনিক ভারতবর্ষেই কি এবিষয়ে আমাদের নূতন আশার কোন কারণ দেখা যাইতেছে বলা যায়? কেহ কেহ বলিবেন, যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাণাড়ে বা গোখেলের জন্ম, সে দেশের ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা কর, মনে হইবে এ বুঝি নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপের তীব্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ। জীবনের সর্ব্ববিভাগে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রতিভাশালীর সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, ইহা কি করিয়া অস্বীকার করা যায়? আর সেই সংখ্যা যে অনুকূল অবস্থার অভাবে, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসের দিকেই যাইতেছে ইহাও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জাতীয় ধ্বংসের প্রাক্কালে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয় আমরা তাহার কতকগুলি যথাসাধ্য অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই যে এই লক্ষণগুলি একত্রে বা একসময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা নহে। তবে তাহার কোন কোনটি বা কতকগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলেই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয় বলিতে পারা যায়; কেমনা এই সকল লক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত,—একটি আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল শক্তি জাতীয় জীবনের গোড়ায় থাকিয়া জাতিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায় আমরা সেই সকলকেই জাতীয় ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে করি। এই সকল লক্ষণ অন্তর্নিহিত সেই কারণসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ। বারান্তরে জাতীয় ধ্বংসের সেই কারণ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা

["কুলতত্ত্বার্ণব" অবলম্বনে লিখিত]

কুলতত্ত্বার্ণব একটি কুলগ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত। ইহাতে মহারাজ আদিশূরের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্ত বিস্তৃতরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যে সকল রাজগণের অধিকারকালে উক্ত ব্রাহ্মণগণের সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই গ্রন্থ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এবং গ্রন্থকর্ত্তাও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা স্বনামধন্য কুলাচার্য্য শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র শ্রীসর্ব্বানন্দ মিশ্র। তিনি গ্রন্থারম্ভে ইষ্ট-দেবতাকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছেন; যথা,

"নত্বেষ্টদেবতাং ভক্ত্যা ধ্রুবানন্দাত্মজো দ্বিজঃ।
সর্ব্বানন্দাভিধেয়স্তু মিশ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥
শ্রীমাদিশূরনৃপতেঃ পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে।
কান্যকুব্জাদাগতা যে পঞ্চ বিপ্রাশ্চ সাগ্নিকাঃ॥
তদ্বংশজানাং বৃত্তান্তজ্ঞানার্থঞ্চৈব বিস্তরাৎ।
কুলগ্রন্থং বহুবিধমবলোক্য পুনঃ পুনঃ॥
তৎসারসংগ্রহং গ্রন্থং কুলতত্ত্বার্ণবাখ্যকম্।
ইতিহাসক্রমেণৈব বক্তি বিপ্রানুরোধতঃ॥"

অর্থাৎ, পূর্ব্বে গৌড়দেশাধিপতি আদিশূরনৃপতি কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জদেশ হইতে আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চকের সবিস্তর বংশবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থ কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া, নানাবিধ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সমালোচনাপূর্ব্বক প্রাচীন বহুতর কুলগ্রন্থের সারসংগ্রহস্বরূপ কুলতত্ত্বা-র্ণবনামক গ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে ইতিহাসক্রমে রচনা করিতেছেন।

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষভাগে স্বীয় পিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

"ততো দেবীবরস্যান্তে শাকেঽদ্ধিখবিধীন্দুমে।
মত্তাতঃ শ্রীধ্রুবানন্দঃ কুলাচার্য্যো প্রতিষ্ঠিতঃ॥
দৃষ্ট্বা মেলিকুলীনানাং তদা মেলব্যতিক্রমম্।
দ্বিজানুরোধতস্তেন কৃতা বৈ মেলকারিকা॥
প্রত্যেকস্য চ মেলস্য মেলোঽন্যঃ প্রতিযোগিকঃ।
তস্যাং মেলকারিকায়াং মৎপিত্রাচাবধারিতঃ॥

অর্থাৎ, অনন্তর দেবীবরের পর ১৪০৭ শাকে (১৪৮৫ খৃঃ) আমার পিতা শ্রীধ্রুবানন্দ কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন মেলী কুলীনদিগের মেলব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। প্রত্যেক মেলের যে অন্য প্রতিযোগী মেল, অর্থাৎ যাহার সহিত কুলকর্ম্ম করিলে মেল দূষিত হয় না, তাহা আমার পিতা মেলকারিকায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভাগ্যকুলের একটি ছাত্র নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার 'হস্তলিখিত' পুঁথিগুলির মধ্যে কুল-তত্ত্বার্ণব নামে একখানি গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় দেখিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তুর্কাগ্রাম নিবাসী সুখদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু নানাবিধ সাংসারিক প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন তিনি মুদ্রিত করিতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ গ্রন্থ কলিকাতা কর্পোরেশন্ ষ্ট্রীটস্থ মহাকালী পাঠশালার হেড্ পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তগত হয়। ইহাই পুস্তকপ্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যত শীঘ্র পারা যায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এক্ষণে আমি কুলতত্ত্বার্ণবের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া আদিশূরের সময় হইতে ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। মধ্যে মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলিমাত্র উদ্ধৃত করিব; নতুবা প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। মহারাজ আদিশূর গৌড়েশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুরাজগণকে পরাজিত করিয়া একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে মগধ ও মালব এবং দক্ষিণে কর্ণাট ও মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগের রাজগণ তাঁহার সামন্ত রাজা ছিলেন; অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্বমুখে একটি রেখা টানিয়া উহাকে আসামের সহিত যোগ করিলে উহার দক্ষিণবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ লক্ষিত হয়, উহা হইতে মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর বাদ দিলে স্থূলতঃ যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহাতেই মহারাজ আদিশূরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কর্ণাট প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যের যে আধুনিক সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতেই হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্য বাদ দিতে হয়; বস্তুতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত রেখার দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগের তিনি সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কান্যকুব্জাধিপতিকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। তদীয় রাজ্য মালবের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। কুলতত্ত্বার্ণবে আদিশূরের রাজপ্রভাব এইরূপ বর্ণিত আছে; যথা,—

"অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্ স্বীয়দেশান্ বিদেশান্
কর্ণাটং কেরলাখ্যং মলয়ভটকৈরন্বিতং কামরূপম্।

অর্থাৎ, পূর্ব্বে গৌড়দেশাধিপতি আদিশূরনৃপতি কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জদেশ হইতে আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চকের সবিস্তর বংশবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থ কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া, নানাবিধ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সমালোচনাপূর্ব্বক প্রাচীন বহুতর কুলগ্রন্থের সারসংগ্রহস্বরূপ কুলতত্ত্বার্ণবনামক গ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে ইতিহাসক্রমে রচনা করিতেছেন।

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষভাগে স্বীয় পিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

"ততো দেবীবরস্যান্তে শাকেঽদ্ধিখবিধীন্দুমে।
মত্তাতঃ শ্রীধ্রুবানন্দঃ কুলাচার্য্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
দৃষ্ট্বা মেলিকুলীনানাং তদা মেলব্যতিক্রমম্।
দ্বিজানুরোধতস্তেন কৃতা বৈ মেলকারিকা॥
প্রত্যেকস্য চ মেলস্য মেলোঽন্যঃ প্রতিযোগিকঃ।
তস্যাং মেলকারিকায়াং মৎপিত্রাচাবধারিতঃ॥

অর্থাৎ, অনন্তর দেবীবরের পর ১৪০৭ শাকে (১৪৮৫ খৃঃ) আমার পিতা শ্রীধ্রুবানন্দ কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন মেলী কুলীনদিগের মেলব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। প্রত্যেক মেলের যে অন্য প্রতিযোগী মেল, অর্থাৎ যাহার সহিত কুলকর্ম্ম করিলে মেল দূষিত হয় না, তাহা আমার পিতা মেলকারিকায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভাগ্যকুলের একটি ছাত্র নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার 'হস্তলিখিত' পুঁথিগুলির মধ্যে কুলতত্ত্বার্ণব নামে একখানি গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় দেখিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তুর্কাগ্রাম নিবাসী সুখদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু নানাবিধ সাংসারিক প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন তিনি মুদ্রিত করিতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ গ্রন্থ কলিকাতা কর্পোরেশন্ ষ্ট্রীটস্থ মহাকালী পাঠশালার হেড্ পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তগত হয়। ইহাই পুস্তকপ্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যত শীঘ্র পারা যায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এক্ষণে আমি কুলতত্ত্বার্ণবের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া আদিশূরের সময় হইতে ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। মধ্যে মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলিমাত্র উদ্ধৃত করিব; নতুবা প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। মহারাজ আদিশূর গৌড়েশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুরাজগণকে পরাজিত করিয়া একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে মগধ ও মালব এবং দক্ষিণে কর্ণাট ও মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগের রাজগণ তাঁহার সামন্ত রাজা ছিলেন; অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্বমুখে একটি রেখা টানিয়া উহাকে আসামের সহিত যোগ করিলে উহার দক্ষিণবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ লক্ষিত হয়, উহা হইতে মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর বাদ দিলে স্থূলতঃ যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহাতেই মহারাজ আদিশূরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কর্ণাট প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যের যে আধুনিক সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতেই হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্য বাদ দিতে হয়; বস্তুতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত রেখার দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগের তিনি সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কান্যকুব্জাধিপতিকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। তদীয় রাজ্য মালবের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। কুলতত্ত্বার্ণবে আদিশূরের রাজপ্রভাব এইরূপ বর্ণিত আছে; যথা,—

"অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্ স্বীয়দেশান্ বিদেশান্
কর্ণাটং কেরলাখ্যং মরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপম্।

সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং গুর্জ্জরঞ্চ
হিত্বা বৈ কান্যকুব্জাধিপতিমথনৃপাস্তস্যবশ্যাস্তদাসন্ ॥"

অর্থাৎ তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহুরাজগণকে, অর্থাৎ রাজভট বা তদ্‌বংশীয়দিগের অধিকৃত কামরূপ এবং মগধ, অঙ্গ (ভাগলপুর), বঙ্গ, কলিঙ্গ, (উড়িষ্যা), কর্ণাট (কর্ণাটিক), কেরল (মালাবার উপকূল), সৌরাষ্ট্র (সুরাট), গুর্জ্জর (গুজরাট), ও মালবদেশের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; কান্যকুব্জের অধিপতি ব্যতীত অন্য নৃপতি সকল তৎকালে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন।

একদা মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিলেন, পূর্ব্বে অন্ধ্রবংশীয় শূদ্রক নৃপতি অনপত্যতানিবন্ধন পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত সারস্বত প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া এই বিপ্রবর্জ্জিত বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন। আপনারা তাঁহাদের বংশধর; অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া একটি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, মহারাজ! আমরা বৈদিক অনুষ্ঠানে একান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি, আপনি কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। রাজা তাঁহাদিগের উপদেশে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহারাজ! নৃপতি বীরসিংহ এই পতিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিবেন না। তখন রাজা পুনর্ব্বার দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পাঁচটি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রেরণ না করিলে তিনি কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবেন। দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা বীরসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বিনাযুদ্ধে ব্রাহ্মণ পাঠাইবেন না। তখন মহারাজ আদিশূর যুদ্ধ-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া প্রধান অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি রাজা বীরসিংহ অতীব ধার্ম্মিক ও গোবিপ্র-প্রতিপালক; অতএব যদি কৌশলে

কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে লোকক্ষয়ের প্রয়োজন কি? আপনি ব্রাহ্মণগণকে সৈনিক করিয়া বৃষবাহনে প্রেরণ করুন, তাহা হইলে তিনি গোবিপ্র-বধভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ফলতঃ তাহাই হইল, রাজা বীরসিংহ জয় অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষণকেই শ্রেয়স্কর কল্প মনে করিয়া পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। এদিকে যে সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণ সৈনিকবেশে গিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া বৃষারোহণজ দোষ হইতে মুক্ত করিলেন। এই সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণই সপ্তশতী নামে আখ্যাত হইলেন।

কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন; তাঁহাদিগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তত্ত্বার্ণবকার বলিতেছেন,—

> "নৃপাদেশেন তে শূরৈঃ রক্ষকৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
> বিপ্রাদ্রাজন্যজাতৈর্বঙ্গদেশং সমাযযুঃ॥
> আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাণতূণ—
> কোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরভূষাঃ।
> কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে,
> শাকে শরাব্ধিঋতুমে জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥"

অর্থাৎ, রাজা বীরসিংহের আদেশে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাবল রক্ষকের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। এই পঞ্চ রক্ষক বিপ্রের ঔরসে ও বিপ্রের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তনামক ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য; অসি, বাণ, ধনুঃ ও রম্য কবচ প্রভৃতি তাঁহাদিগের শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছিল; তাঁহারা পঞ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জদেশ হইতে ৬৭৫ শাকে (৭৫৩ খৃঃ) বঙ্গে আগমন করিলেন।

দূত ব্রাহ্মণগণের আগমনসংবাদ মহারাজ আদিশূরের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বীয় জন্ম সার্থক মনে করিলেন এবং আনন্দে

দূতকে স্বীয় কাঞ্চনময় হার পারিতোষিক প্রদান করিলেন। অনন্তর ভূপতি দ্বিজদর্শনের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণগণ সৈনিকবেশধারী, ব্রাহ্মণের বেশ-ভূষার চিহ্নমাত্র তাঁহাদিগের নাই; তখন বিস্মিত চিত্তে এ কি, এ কি, বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে না দেখিয়া সহসা তাঁহাদিগের হস্তস্থিত দূর্ব্বা ও অক্ষত স্তম্ভকাষ্ঠের মৌলিদেশে স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিবামাত্র উহাতে অঙ্কুর দৃষ্ট হইল। দূত এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাজাকে সংবাদ দিয়া বলিল; যথা,—

> "আয়াতা ব্রহ্মরূপাঃ ক্ষিতিবিবুধবরাঃ পঞ্চ কোলাঞ্চদেশাৎ
> সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তা ধনুরপি সশরং পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ।
> তেষামাশীঃপ্রভাবাৎ ক্ষণমপি কঠিনাদঙ্কুরাণাং সমূহঃ
> শুষ্কস্তম্ভাদকস্মাৎ সমজনি পরিতশ্চিত্রমেতদ্ব্যলোকি ॥"

অর্থাৎ, মহারাজ! অতীব আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, তাঁহাদিগের শিরোদেশে উষ্ণীষ, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও পৃষ্ঠদেশে সশর ধনুঃ; তাঁহাদিগের আশীর্ব্বচনের প্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে শুষ্ক স্তম্ভকাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অকস্মাৎ অঙ্কুরসমূহ উৎপন্ন হইল!

রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্তম্ভসমীপে আসিয়া শুষ্ক স্তম্ভ অঙ্কুরিত দেখিয়া অপরাধীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, আপনারা দয়া করিয়া স্ব স্ব গোত্রনামাদি পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিলে তন্মধ্যে একজন পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন; যথা,—

"ইতি রাজগিরঃ শ্রুত্বা ক্ষিতীশস্তমুবাচ হ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতোঽহং ক্ষিতীশ ইতিনামকঃ॥
বীতরাগ ইতিখ্যাত এষ কাশ্যপগোত্রজঃ।
অসৌ সুধানিধির্নাম্না বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভবঃ॥
ভারদ্বাজগোত্রজোঽসৌ মেধাতিথিরিতিস্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রজোঽসৌতু সৌভরিরিতি বিশ্রুতঃ॥
কান্যকুব্জেশ্বরাদেশাদ্ বয়ং পঞ্চ দ্বিজা নৃপ।
ভবতাস্ত্র মখং কর্ত্তুমাগতা গৌড়মণ্ডলে॥"

অর্থাৎ, রাজার এই বাক্য শুনিয়া ক্ষিতীশ তাঁহাকে বলিলেন, আমি শাণ্ডিল্যগোত্রজ, আমার নাম ক্ষিতীশ। ইনি কাশ্যপগোত্রজ, ইঁহার নাম বীতরাগ। ইনি বাৎস্যগোত্রজ, ইঁহার নাম সুধানিধি। ইনি ভারদ্বাজগোত্রজ, ইঁহার নাম মেধাতিথি। আর ইনি সাবর্ণগোত্রজ, ইঁহার নাম সৌভরি। আমরা পাঁচ জন কান্যকুব্জাধিপতির আদেশে আপনার যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত গৌড়মণ্ডলে সমাগত হইয়াছি।

ইহা শুনিয়া রাজা হর্ষপরিপ্লুত হইলেন এবং পাদ্যাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে মনোরম বাসস্থান প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা শুভ দিনে সদক্ষিণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আদেশে পুত্রকারক চরু মহিষীকে প্রদান করিলেন। দ্বিজগণ এইরূপে আদিশূরের যজ্ঞ সমাধান করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ দ্বিজগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং অজ্ঞাত লোকের যাজন করিয়াছেন; এই হেতু আপনারা পতিত হইয়াছেন; অতএব আপনারা যদি পুনঃসংস্কাররূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের সহিত ব্যবহার করিতে পারি, নতুবা নহে। যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণ দেখিলেন প্রায়শ্চিত্তব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে কেহই সম্মত নহেন, তখন তাঁহারা ভার্য্যাপুত্রাদি

ও পঞ্চ রক্ষকের সহিত পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত গঙ্গাতীরের সমীপে পাঁচটি গ্রাম ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। তন্ত্রার্ণবকার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যথা,—

"ক্ষিতীশায় ব্রহ্মপুরীং বীতরাগায় কামঠীম্।
বটগ্রামং সৌভরিণে দদৌ নরপতিস্তদা॥
মেধাতিথ্যভিধেয়ায় কঙ্কগ্রামং মনোরমম্।
তং সুধানিধয়ে চাপি হরিকোটমনুত্তমম্॥
ক্ষিতীশাদিদ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চ রক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এব চ॥
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্যধর্ম্মিণঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ॥"

অর্থাৎ, তখন নরপতি ক্ষিতীশকে ব্রহ্মপুরী, বীতরাগকে কামঠী, সৌভরিকে বটগ্রাম, মেধাতিথিকে সুন্দর কঙ্কগ্রাম, এবং সুধানিধিকে কমনীয় হরিকোট প্রদান করিলেন। ক্ষিতীশাদি দ্বিজগণের সহিত পঞ্চ রক্ষক আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নাম মকরন্দ, দশরথ, পুরুষোত্তম, কালিদাস ও দাশরথি; তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। তাঁহাদিগের প্রার্থনায় রাজা তাঁহাদিগকেও বাসের নিমিত্ত ভূমি প্রদান করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে আদিশূর পরলোক গমন করিলেন, তদীয় পুত্র ভূশূর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর মগধেশ্বর ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড় রাজধানী) হইতে বিতাড়িত করিলেন। এইরূপে ভূশূর বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করিলেন এবং তথায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। এদিকে কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের তেইশটি পুত্র হইয়াছিল। কুলতত্ত্বার্ণবে এইরূপ বর্ণিত আছে ; যথা,—

"ভট্টনারায়ণো দামোদরঃ সৌরিস্তথৈব চ।
বিশ্বেশ্বরঃ শঙ্করশ্চ পঞ্চৈতে তু ক্ষিতীশজাঃ॥
দক্ষঃ সুষেণোভানুশ্চ কৃপানিধিরথাপরঃ।
বীতরাগস্য তনয়া এতে বৈ বেদসংখ্যকাঃ।
সুধানিধিসুতৌ দ্বৌতু শ্রীচ্ছান্দড়ধরাধরৌ।
শ্রীহর্ষো গৌতমশ্চৈব শ্রীধরঃ কৃষ্ণ এব চ॥
শিবোদুর্গারবিশ্চৈব শশীচৈতে দ্বিজোত্তমাঃ।
মেধাতিথ্যভিধেয়স্য দ্বিজস্যৈবাষ্টসূনবঃ॥
বেদগর্ভোরত্নগর্ভঃ পরাশরমহেশ্বরৌ।
চত্বারস্তনয়া এতে সৌভরেস্তু মহাত্মনঃ॥
তপোবিদ্যাগুণৈঃ সর্ব্বে পিতৃতুল্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ॥
বেদগর্ভো দ্বিজাশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভৃতা।
পূর্ব্ববাসস্ত সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ॥
ভট্টনারায়ণাদীনাং বাসার্থং স্থানমেব চ।
দদৌ বহূনি রত্নানি ভূশূরোনৃপসত্তমঃ॥
রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ॥
দামোদরাদয়ো যেতু পূর্ব্ববাসং ন তত্যজুঃ।
বরেন্দ্রদেশবাসিত্বাত্তে বারেন্দ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ, ভট্টনারায়ণ, দামোদর, সৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর এই পাঁচজন ক্ষিতীশের পুত্র ; দক্ষ, সুষেণ, ভানু ও কৃপানিধি, এই চারিজন বীতরাগের পুত্র ; ছান্দড় ও ধরাধর এই দুইজন সুধানিধির

পুত্র ; শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী, এই আটজন মেধাতিথির পুত্র এবং বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর, এই চারিজন মহাত্মা সৌভরির পুত্র। ইঁহারা সকলেই তপস্যা, বিদ্যা ও সদ্‌গুণে পিতৃতুল্য। (ইঁহাদিগের মধ্যে) ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ, এই পাঁচজন পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া ভূশূর নৃপতির সহিত রাঢ়দেশে আগমন করিলেন। মহারাজ ভূশূর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে বাসের নিমিত্ত স্থান ও বহু রত্ন প্রদান করিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে বসতিহেতু দেশের নামানুসারে রাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ; কিন্তু দামোদর প্রভৃতি (অন্য ভ্রাতৃগণ) যাঁহারা পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন।

এক্ষণে কুলতত্ত্বার্ণবে বর্ণিত কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত হইতে যে একটি অভিনব বিষয় আমরা দেখিলাম, তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এদেশে প্রসিদ্ধি আছে যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই প্রসিদ্ধিহেতু একটি সহজ বিষয় জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে কুলতত্ত্বার্ণবের ইতিবৃত্ত তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিল। বিষয়টি বিবৃত করিয়া বলিতেছি। শাণ্ডিল্যগোত্রজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ, বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষ নারায়ণভট্ট। ভরদ্বাজগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ, বারেন্দ্রমতে গৌতম ; কাশ্যপগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ দক্ষ, বারেন্দ্রমতে সুষেণ। বাৎস্যগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ ছান্দড়, বারেন্দ্রমতে ধরাধর। সাবর্ণগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ বেদগর্ভ, বারেন্দ্রমতে পরাশর। যদি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশধর হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না। এই বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়া কেহ কেহ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এবিষয়ে

অণুমাত্র জটিলতা থাকে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বারেন্দ্রমতে আদিপুরুষ গৌতম, রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ শ্রীহর্ষের ভ্রাতা; বারেন্দ্রমতে আদিপুরুষ সুষেণ, দক্ষের ভ্রাতা; বারেন্দ্রমতে আদিপুরুষ ধরাধর, ছান্দড়ের ভ্রাতা; বারেন্দ্রমতে আদিপুরুষ পরাশর, বেদগর্ভের ভ্রাতা। রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের চারি ভ্রাতার নাম দামোদর, সৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন ভ্রাতা নারায়ণভট্ট নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে; এক ব্যক্তির দুই নাম একান্ত বিরল নহে। চারিজনের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বৈসাদৃশ্য নাই দেখিলে একজনের সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন, এই ভ্রান্ত প্রসিদ্ধিকে কটাক্ষ করিয়া নুলো পঞ্চানন বলিতেছেন; যথা,—

"হাত ঘুরাইয়ে নুলো বলে জেনো নাহি ভুলো
তাদের আগে আসে অত্র পিতা।
এসব হরিমিশ্রের আর যে এড়ু মিশ্রের
পুঁথি দেখে ভাটের লেখা কথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, বস্তুতঃ ভট্টনারায়ণাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে আগমন করেন, কালক্রমে এই ঘটনা বিকৃত হওয়ায় তাঁহারাই কান্যকুব্জ হইতে প্রথম আসিয়াছিলেন, এই ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা সমীচীন বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের রক্ষক, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। তাঁহারা বঙ্গীয় প্রধান কায়স্থগণের আদিপুরুষ। কোন কোন মিশ্রগ্রন্থে তাঁহারা দাস বা ভৃত্য শব্দে অভিহিত

হইয়াছেন। ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না। যদি কোন রাজার ক্ষত্রিয় অঙ্গরক্ষক থাকে, তাহাকে রাজভৃত্য বলিলে কোন দোষ হয় না। ভৃত্য শব্দের নীচ ভৃত্য অর্থ করিলেই গোল-যোগ হয়। আর এক কথা, যে মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণগণ শুষ্ক কাষ্ঠকে অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মতেজের নিকট ক্ষত্রিয়বল অবনত হইলেই তাহা গৌরবের কারণ হয়, বরং ঔদ্ধত্যই হীনতা সূচনা করে; সুতরাং কায়স্থগণ যে অদ্যাপি দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-ভক্তিরূপ অতীত গৌরবই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। কায়স্থগণ কি বিশিষ্ট কারণে ও কোন্ সময়ে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় আচার পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার গ্রহণ করিলেন এ জটিল রহস্যভেদ করিতে আমি একান্ত অক্ষম। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা ত্রেতাযুগে পরশুরামের ভয়ে শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এ সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহারা রাজন্যধর্ম্মী হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন এ কথার সহিত বিরোধ ঘটে। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাশয়দিগের হস্তে এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি। ভূশূরের মৃত্যুর পর ক্ষিতিশূর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পিতা বরেন্দ্রভূমি হইতে ভট্টনারায়ণাদি যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ছাপ্পান্নটি পুত্র হইয়াছিল। মহারাজ ক্ষিতিশূর তাঁহাদিগের বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যানুসারে তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত ছাপ্পান্নটি গ্রাম প্রদান করি-লেন। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের নামানুসারে 'গ্রামী' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। কুলতত্ত্বার্ণবে; যথা,—

> "ষট্পঞ্চাশৎসুগ্রামেষু কৃতে বাসে চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
> গ্রামীতিসংজ্ঞাং তে প্রাপু গ্রামনামানুসারতঃ॥"

অর্থাৎ, সেই ব্রাহ্মণেরা ছাপ্পান্নটি সুন্দর গ্রাম পাইয়া তথায়

বাস করিলে পর গ্রামনামানুসারে 'গ্রামী' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

ক্ষিতিশূর পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র মহীশূর রাজা হইয়া পিতা ও পিতামহের অনুসৃত পদ্ধতিক্রমে ব্রাহ্মণগণের পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পৃথ্বীশূর রাজা হন; তিনিও বেদ-বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণের পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তে তদীয় পুত্র ধরাশূর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মকর্ম্মের অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিধিবৎ অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিলেন এবং কুলাচল ও সৎ শ্রোত্রিয় এই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর ধরাশূরের লোকান্তে তদীয় পুত্র চন্দ্রশূর রাজা হইলেন এবং চন্দ্রশূরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সোমশূর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোমশূর অপুত্রক ছিলেন; তিনি পরলোক গমন করিলে বল্লালসেন তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালসম্বন্ধে কুলতত্ত্বার্ণবে এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

"পুত্রহীনঃ স নৃপতিঃ কালে পঞ্চত্বমাগতে।
বল্লালসেনসংজ্ঞশ্চ তস্য রাজ্যে নৃপোঽভবৎ॥
মহাবলপরাক্রান্তো রাজনীতিবিশারদঃ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ॥
দাতা চ বিনয়ী শান্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ।
ন্যায়মার্গানুসারেণ সদারাজ্যমপালয়ৎ॥
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বাচাতিগুণোত্তমান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশোমূর্ত্তীনিবাস্থিতান্॥
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি যশো মম।
যথা ক্রমাৎ সতাং গেহে ভবেত্তদ্বিদধাম্যহম্॥

ইত্যেকদৈব লক্ষিস্ত্য বল্লালো বৈদ্যবংশজঃ।
কৃতপ্রতিজ্ঞোঽভবদ্‌দ্বিজানাং কুলবন্ধনে ॥”

অর্থাৎ, অপুত্রক নরপতি সোমশূর কালক্রমে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে বল্লালসেন তদীয় রাজ্যে রাজা হইলেন। তিনি পরাক্রান্ত, রাজনীতিজ্ঞ, দেবব্রাহ্মণভক্ত, ধার্ম্মিক, দাতা, বিনয়ী, শান্ত, ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা রাজ্যপালন করিতেন। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভব ছিলেন। বল্লালসেন দেখিলেন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ অতি গুণবান্, তাঁহারা যেন আদিশূর নৃপতির মূর্ত্তিমান্ যশোরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে একটি ইচ্ছার উদ্রেক হইল। তিনি মনে করিলেন আদিশূরের কীর্ত্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া আমার কীর্ত্তি যাহাতে ক্রমে সজ্জনগণের গৃহে বিস্তৃত হয়, আমাকে তাহা করিতে হইবে। একদা এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

এতদ্দারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, বল্লালসেন বৈদ্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। বিজয়সেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বল্লাল শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন; সুতরাং তিনি সোমশূরের কন্যা বা ভগিনীর পুত্র ছিলেন, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের গুণদোষের বিচার করিয়া মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা আচারাদি নবগুণসম্পন্ন, তাঁহারা মুখ্য কুলীন, যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় গুণসম্পন্ন নহেন, তাঁহারা গৌণ কুলীন, এবং যাঁহারা গুণদোষবিমিশ্র, তাঁহারা শ্রোত্রিয় হইলেন। যে সকল শ্রোত্রিয়ের অল্প দোষ ও বহু গুণ ছিল, তাঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং যে সকল শ্রোত্রিয়ের গুণ অল্প কিন্তু দোষের বাহুল্য ছিল, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। এইরূপে মহারাজ বল্লালসেন বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণকে কুলীন

করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সহর্ষে তাম্রশাসন প্রদান করিলেন। কিছুদিন গত হইলে মহারাজ পুনর্ব্বার বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বন্দ্য, মুখোটী, গাঙ্গুলি, কাঞ্জি, কুন্দ, পূতি, ঘোষাল ও চট্ট এই আটগ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে বল্লাল ভূপতি চিন্তা করিলেন, আমি যে আটগ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন করিয়াছিলাম, তাঁহারা এক্ষণে কে কিরূপ আচরণ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া যাঁহাদিগকে দোষযুক্ত দেখিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; তাঁহারা অবরকুল হইলেন। যাঁহারা বৈধ ও অবৈধ মিশ্র আচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন এবং যাঁহারা সদাচারমাত্রনিরত ছিলেন, তাঁহারা মুখ্য কুলীন হইলেন। ১০৯৭ শাকে (১১৭৫ খৃঃ) এই কুলবন্ধন সম্পন্ন হয়। কুলতত্ত্বার্ণবে; যথা,—

"মুখ্যগৌণাবরঞ্চৈব চকার স ত্রিধা কুলম্।
শাকে সপ্তাঙ্কশূন্যেন্দুমিতে নরপতিঃ স্বয়ম্॥"

এইরূপ কুলনির্দ্ধারণ করিয়া ভূপতি বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি, স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা একটি সুমহান্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন এবং যজ্ঞান্তে একটি স্বর্ণময়ী ধেনু দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পাঁচিশজন ব্রাহ্মণ সেই ধেনুটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে কুল হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং পুত্র লক্ষ্মণসেনকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন; যথা,—

"আহূয় তং সমং পুত্রং লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ সঃ।
শৃণু পুত্র ময়া যদ্‌যৎকৃতং কার্য্যঞ্চ সাম্প্রতম্॥
তত্তৎ সর্ব্বং সমালোক্য বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
দ্বিজানাং কুলচর্য্যা চ সদা কার্য্যাত্বয়া মুহুঃ॥"

"ততো বল্লালসেনস্তু পুত্রং লক্ষ্মণসেনকং।
পুনঃপুনরুবাচেদং শৃণু বৎস সমাহিতঃ॥
রক্ষিতব্যং ত্বয়া নূনং কুলীনানাং কুলং সদা।
কুলপ্রথা চেক্ষিতব্যা ময়া যা হ্যবধারিতা॥"
"এবমুক্ত্বা সুতং রাজা ক্ষিতীশাদিদ্বিজন্মনাম্।
পূর্ব্বাপরাণাং বংশ্যানাং নামানি সংনিবেশ্য চ॥
কুলগ্রন্থমরচয়ৎ শাকেঽগ্নিখেন্দুচন্দ্রমে॥"

অর্থাৎ, তিনি আত্মসদৃশ পুত্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমি এক্ষণে যে যে কার্য্য করিলাম, তুমি সেই সমস্ত আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণদিগের কুল-চর্চ্চা মুহুর্মুহুঃ করিবে।

অনন্তর বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগি-লেন, বৎস! শ্রবণ কর; তুমি সাবধানে সর্ব্বদা কুলীনগণের কুল-রক্ষা করিবে এবং আমি যে কুলপ্রথা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

রাজা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ক্ষিতীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বাপর বংশধরদিগের নাম সন্নিবেশ করিয়া ১১০৩ শাকে (১১৮১খৃঃ) একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বল্লালসেন পরলোক গমন করি-লেন। লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পিতা বল্লালসেন জাহ্নন প্রভৃতি উনিশ জন ব্রাহ্মণকে কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কলহ-বৃত্তান্ত মহারাজ লক্ষ্মণের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি পিতৃনির্দ্দিষ্ট কুলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমতঃ বংশপরিবর্ত্ত দেখিলেন, অর্থাৎ কুলীন কন্যাটি যাঁহার গৃহে প্রদত্ত

হইয়াছে, তাঁহার গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ বংশের বলাবল দেখিলেন, অর্থাৎ কে কি প্রকার উচ্চ বা নীচ বংশে আদানপ্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি কুলীনদিগের আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও মধ্যাংশাদি পঞ্চদশ প্রকার অংশ বা ভাব নিরূপণ করিলেন। অনন্তর দুইবার সমীকরণ করিলেন, অর্থাৎ কুলীনগণের আচারাদি গুণদ্বারা মর্য্যাদার সমতা নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রথম সমীকরণে উৎসাহের পুত্র আহিতাদি সাতজন ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় সমীকরণে অরবিন্দ প্রভৃতি চৌদ্দ জন ব্রাহ্মণ সমতাহেতু কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন এই একুশ জন ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে পূজা করিলেন।

শ্রীকুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গরাজ্য

ধরণী হইবে স্বর্গরাজ্য!—একি, মা, স্বপ্ন, সত্য নয়!
সে প্রেম আজি কি সুপ্তি-মগ্ন, যে প্রেম করিবে বিশ্ব-জয়!
যুগে যুগে তবে কিসের লাগিয়া সহিল ভক্ত অশেষ ক্লেশ,
শক্তি-দম্ভ নাচিবে তাথৈ, ধর্ম্মের রবে ছিন্ন বেশ!
নূতন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞান,
নূতন সাধনা,—নূতন বিধানে জগৎ লভিবে নূতন প্রাণ।

তোমার পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন, ধূলায় লুটাবে গরিমা তার,
তোমার নামের মহিমার গানে, এ মহাশ্মশান জাগেনা আর!

এস, মা, বীর্য্য-সিংহ আরোহি, হাস, মা, শুভদে, নাশিয়া ভয়!
অমল-আনন-আভায় ধরায় হউক পুণ্য প্রভাতোদয়!
নূতন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞান,
নূতন সাধনা,—নূতন বিধানে জগৎ লভিবে নূতন প্রাণ।

আসুক্ প্রলয় ঝটিকা ঝঞ্ঝা, রক্ত-চরণ-মরণ ভয়,
আসিবে মিলন শান্তি-আলোকে, এ আঁধার ঘোর কিছুই নয়!
কর্ম্মে পাথেয় তব শুভাশিষ, মর্ম্মে দিব্য মুরতি খানি,
বিপদে বর্ম্ম স্নেহের পরশ, ধর্ম্মে তোমার আদেশ বাণী!
নূতন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞান,
নূতন সাধনা,—নূতন বিধানে জগৎ লভিবে নূতন প্রাণ।

উজলি আঁধার উদিবে আলোক, স্বার্থ চূর্ণ হইবে প্রেমে,
ভূতল উঠিবে স্বর্গ-ভুবনে, স্বর্গ ভূতলে আসিবে নেমে!
এ যুগ-ধর্ম্ম, এ নব-যজ্ঞ—মুছাবে সবার অশ্রুনীর,
সমন্বয়ের অমৃত-রসে ঘুচিবে লজ্জা শতাব্দীর!
নূতন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞান,
নূতন সাধনা,—নূতন বিধানে জগৎ লভিবে নূতন প্রাণ।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভা

[বাঙ্গলা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য—মধ্যযুগ]

১৮৫৭-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্যোগে চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর বোধ হয় ইহাই প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব অভিনয়ের পর দিবস কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী খ্যাতনামা বাবু আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সেই বৎসর মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও তাঁহার বাটীতে বেণীসংহার নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। বেণীসংহার অভিনয়ের আট মাস পরে সিংহ মহোদয়ের বাটীতে সমধিক সমারোহের সহিত তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। * * * * আশুতোষ বাবুর বাটীতে শকুন্তলা অভিনয়ের সময় কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং বাবু (এক্ষণে স্যার মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নাটকের রসাস্বাদ করিয়া ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নাটকাভিনয়ের অনুরাগী হইয়াছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন,—"দেখুন, দুই এক দিনের আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করিয়া

স্থায়ীভাবে একটি নাট্যশালা সংস্থাপন করিতে পারিলে বোধ হয় অধিক উপকার হয়।" রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ইহার পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা নাটক অভিনয়ের উত্তোগী ছিলেন। সুতরাং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের এই প্রস্তাব তাঁহার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র উভয়েরই বিশেষ মনঃপূত হইল। তাঁহাদিগের সুহৃদ্‌গণও, সকলেই, এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রাজারা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেলগাছিয়াস্থ সুন্দর উত্তান ক্রয় করিয়াছিলেন। নাট্যশালা তথায় নির্ম্মিত হওয়া স্থির হইলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং নাট্যশালা নির্ম্মাণের এবং আনুসঙ্গিক সমস্ত আয়োজন সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন।*

এইরূপে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের শৈশবলীলার সূতিকাগার বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে নাট্যকারের খোঁজ পড়িল এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্বে প্রখ্যিতনামা রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় রত্নাবলী অবলম্বনে একখানা নাটক লিখিয়া দিবার ভার পাইলেন। যথাসময়ে (৩১শে জুলাই, ১৮৫৮ খৃঃ) মহাসমারোহে রত্নাবলীর অভিনয় হইয়া গেল। রত্নাবলী এরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহার তের চৌদ্দ বার অভিনয় হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ রজনীর অভিনয়ে ইংরেজ দর্শকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং সম্ভ্রান্ত ইংরেজ দর্শকবৃন্দের জন্য রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে ভার পড়িল মধুসূদনের উপর। অনুকূল দৈবঘটনা ভিন্ন এই ব্যাপারকে আর কিছু বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায় না; কারণ এই অনুবাদের ভার মধুসূদনের উপর না পড়িলে আমরা মধুসূদনকে মহাকবি মধুসূদনরূপে পাইতাম কি না

---

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত —৪র্থ সংস্করণ, ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠা।

সন্দেহ। কৃতী পুরুষগণের জীবনে দেখা যায় যে সামান্ত সামান্ত ঘটনা তাহাদের রুদ্ধ কৃতিত্বের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। মধুসূদনের জীবনে রত্নাবলীর অনুবাদ তদনুরূপ ঘটনা। রত্নাবলীর অনুবাদ করিতে বসিয়াই মধুসূদন বুঝিলেন যে অনুরূপ বা শ্রেষ্ঠতর নাট্যকাব্য রচনা-শক্তি তাঁহার মধ্যে আছে। এইরূপে সুপ্ত প্রতিভার উদ্বোধন সাধিত হইল এবং যে শক্তি Captive Ladyর বন্দিনীত্ব মোচন করিতে যাইয়া স্বয়ং বিজাতীয় ভাষা ও ভাবের শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা শঙ্কর-জটা-মুক্ত জাহ্নবীর মত নূতন নূতন খাত কাটিয়া নব নব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাহা প্রকাশ করিতে মিথ্যা কৃত্রিম সঙ্কোচের অভাব মধুসূদনের চরিত্রের একটি মূল সূত্র। প্রত্যেক প্রতিভাবান লোকের চরিত্রেই এই বিশেষত্বটি দেখা যায়। জনসাধারণ ইহাকে সাধারণতঃ অহঙ্কার আখ্যা প্রদান করে। রত্নাবলী অনুবাদ-কালে রত্নাবলী নাটকের অসম্পূর্ণতা মধুসূদনের কবিত্বানুভূতিকে নিশ্চয়ই পীড়িত করিয়াছিল। হর্ষের রত্নাবলী নাটক হিসাবে বড় বেশী উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। সমস্তগুলি চরিত্রই কেমন যেন ভোঁতা ধরণের,—যথেষ্ট জীবনীশক্তির অভাবে লোকগুলি যেন টলিয়া টলিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে অনিশ্চিত গতিতে জীবনের পথে চলিয়াছে। তাহার উপর নায়কের চরিত্র এমন অপুরুষোচিত যে পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে যে ধিক্কার রসের আবির্ভাব হয় তাহা জাগ্রত করা নিশ্চয়ই কবির অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। এই ত গেল আসলের অবস্থা। তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ আমরা দেখি নাই। কিন্তু তিনি যে হর্ষের উপর বিশেষ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। তাই মধুসূদনের শুভাকাঙ্ক্ষী গৌরদাস বসাক মহাশয়কে মধুসূদন একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে অকিঞ্চিৎকর নাটক-খানার জন্য সিংহ-রাজভ্রাতৃদ্বয় এত অর্থব্যয় করিতেছেন তাহার চেয়ে ভাল নাটক চেষ্টা করিলে মধুসূদন নিজেই রচনা করিতে

পারেন। রিচার্ডসনের শিষ্য, ইংরেজীতে স্বপ্নদর্শনকারী, স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগী মধুসূদনের কথাটা তখন সকলেরই হাস্যজনক মনে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি আনিয়া বন্ধুসমাজে দাখিল করিলেন, তখন ব্যঙ্গহাস্য আনন্দহাস্যে পরিণত হইয়া গেল। তাহার পর যখন দ্রুতগতিতে—"একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ", ও "পদ্মাবতী" রচিত হইয়া গেল, তখন আর কোন সন্দেহেরই স্থান রহিল না। সাহিত্য-রসিক-গণ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে লাগিলেন যে, অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মধুসূদন বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ বাহির হইলে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ কেন, সামান্য লেখাপড়াজানা মুদি ময়রাগণও দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া আদর করিয়া, মধুসূদনের নবরসপূর্ণ গ্রন্থাবলি পাঠ করিতে লাগিল। *

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমারী রচনার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের নাট্য-জীবন একরকম শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় রচিত মায়-কানন তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, খণ্ডিত কতক কতক অংশমাত্র রচনা করিয়াছিলেন। অপরে তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত "সুভদ্রাহরণ" "বিষ না ধনুর্গুণ" ইত্যাদি নাট্য-চেষ্টা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার মূল সূত্রগুলি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে গেলে দেখা যায় যে স্বাধীনতা ও নব-সৃজনচেষ্টা তাহাদের মধ্যে প্রধানতম ও প্রবলতম,—আদি সাহিত্য-চেষ্টা শর্ম্মিষ্ঠাতেই, তাহার এই দুইটি বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। অবশ্য শর্ম্মিষ্ঠাতে তিনি প্রতিজ্ঞানুরূপ সফলতা দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা রচনাকালেই যে স্বাধীনতা ও নব-সৃজনচেষ্টা সদম্ভে তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী কালে অবিচলিত ভাবে

* জীবনচরিত—৪৮৫ পৃষ্ঠা, ৪২শ পত্রের শেষ ভ

তাহার কবি-জীবনকে পরিচালিত করিয়া সফলতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা রচনা করিলে পর মধুসূদনের কোন কোন হিতৈষী বন্ধু প্রবীণ নাট্যকার রামনারায়ণকে দিয়া তাহা সংশোধিত করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মধুসূদন এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্করত্নের "পণ্ডিতী" সংশোধনে যে মধুসূদন বিশেষ খুসী হন নাই—তাঁহার জীবন-চরিতে প্রকাশিত ১৫শ পত্রই তাহার প্রমাণ।

পত্রখানি মধুসূদনের প্রিয় সুহৃৎ গৌরদাস বসাক মহাশয়কে লিখিত। মধুসূদনের প্রতিভার মূলসূত্র ধরাইয়া দিতে সাহায্য করে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে পত্রটি উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। পত্রটি ইংরেজীতে লেখা, অনুদিত হইলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়,—

রবিবার।

প্রিয় গৌর,

তোমার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষমা করিবে। কথাটা এই যে, এরকম অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমার নাটক বন্ধুদের দেখান ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি না। যা' হউক, তোমাকে যে বলিয়াছি, এই সপ্তাহের শেষে প্রথম তিন অঙ্ক তুমি পাইবে।

রামনারায়ণের "সংস্করণ"—তুমি ঠিক নাম দিয়েছ—দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি। দেখিয়াই আমি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি যে তাহার সংশোধন আমি গ্রহণ করিব না। উঠি কি পড়ি, আমি অন্যের সাহায্য চাই না। রামনারায়ণ আমার সমস্ত কথাগুলি বদলাইয়া দিবে, ইহা নিশ্চয়ই আমার অভিপ্রায় ছিল না। কোন ব্যাকরণের ভুল দেখিতে পাইলে, আমি তাঁহাকে তাহা সংশোধন করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি জান, লেখকের রচনারীতি তাঁহার মনের প্রতিচ্ছায়া; আমার ভয় হয় বন্ধুবর রামনারায়ণ এবং এই বেচারা আমি, উভয়ের মধ্যে মনের খুব বেশী মিল নাই। যাহা হউক, তাহার কিছু কিছু সংশোধন আমি গ্রহণ করিব।

আজ তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হইলে যদি আমার নাটকের

কথা উঠে তবে রামনারায়ণের কথা একেবারে চাপিয়া যাইও। আমি কিছুতেই তাহার সমস্ত সংশোধন গ্রহণ করিব না। আমার নায়িকা বেচারীর মুখে সে যাচ্ছেতাই প্রাণহীন গদ্য বসাইয়া দিয়াছে!

প্রিয় বন্ধু, আমি জানি যে আমার নাটকে খুব সম্ভবতঃ একটা বিদেশী গন্ধ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ভাষা যদি ব্যাকরণ-সম্মত হয়, ভাবসমূহ যদি জীবন্ত ও সুসঙ্গত হয়, ঘটনাসমাবেশ যদি চিত্তাকর্ষক হয়, চরিত্রসৃষ্টি যদি অব্যাহত হয়, তবে বিদেশী গন্ধ থাকিলেই বা কি আসিল গেল? প্রাচ্য ভাবাপন্ন বলিয়া কি মুরের কবিতা ঘৃণার্হ? বায়রণের কবিতায় এশীয় গন্ধ আছে বলিয়া অথবা কার্লাইলের গদ্য জার্ম্মেণীয়ত্বে ভরা বলিয়া কি তাহা অবহেলার যোগ্য? আরও কথা এই যে, মনে রাখিও যে আমি তাহাদের জন্যই লিখিতেছি যাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমারই মত, পাশ্চাত্য ভাবসমূহ এবং চিন্তা-স্রোত যাহাদের মনে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। আর,—যা কিছু সংস্কৃতে লিখিত, তাহাই ভাল, এই দাসত্বপূর্ণ হীন অনুরাগে আমাদের মনের চারিদিকে যে একটা কঠিন শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা দূর করিয়া দেওয়াও আমার এক উদ্দেশ্য।

আমার দুঃসাহসে ভয় পাইও না। আমার দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইয়াছে—এবং তাহা এমন অনেককে দেখাইয়াছি যাহারা ইংরেজী কিছুই জানে না। আমি সত্যি বলিতেছি, তাহারা ইহার এত প্রশংসা করিয়াছে যে তাহাদের সারল্যে আমার মধ্যে মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে আমার খোসামোদ করিয়াছে এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই।

সাহিত্যিক বিষয়ে, ভাই, কাহারও সাহায্য-চিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়া জগৎসমক্ষে দাঁড়াইব না—ইহা আমার গর্ব্ব। একটা গলাবন্ধ বা কোমর-কোর্ত্তা ধার নিতে পারি বটে, কিন্তু সমস্ত পোষাকটা কিছুতেই না। তুমি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইও না, ভাই। আমি তোমাকে বলিতেছি আমি এমন নাটক লিখিব যে টুলো পণ্ডিতরূপী

যত * * * বুড়োর দল অবাক হইয়া যাইবে। যখন যতীন্দ্র এবং রাজাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয় তখন খুব প্রশংসা করিও—বাজারদর চড়াইতে প্রশংসার মত আর কিছুই না। দুই একটি পরিবর্ত্তন ইত্যাদি করাইতে আমার কোন আপত্তি নাই—কিন্তু আমার সমস্ত বাক্য বদলাইয়া দিবে—বটে? তার চেয়ে আমি ওটা পুড়াইয়া ফেলিব।

যথারীতি তোমার—

মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা রচনা করিয়া টুলো পণ্ডিতরূপী বৃদ্ধ * * * -দেরে অবাক করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ টুলো পণ্ডিতগণের সাহিত্যদর্পণে শর্ম্মিষ্ঠার যে প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা "দুঃশ্রবত্ব" "চ্যুতসংস্কারত্ব" "নিহতার্থত্ব" এবং "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ" প্রভৃতি রোমহর্ষণ দোষাবলির আবিষ্কার করিয়া অসঙ্কোচে—"ইহা নাটকই হয় নাই"—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।* কিন্তু জনসাধারণের হস্তে সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বদা সাহিত্যদর্পণ ধৃত থাকে না,—সাদা চোখে তাহারা শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় দেখিয়া এত মাতিয়া গিয়াছিল যে, বর্ত্তমানকালে শর্ম্মিষ্ঠা পড়িয়া উঠিয়া তাহাদের তদানীন্তন মত্ততার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়।

বস্তুতঃ অঙ্কশাস্ত্রে প্রত্যেক অঙ্কের যেমন একটা স্থানীয় মান ও প্রকৃত মান আছে, প্রাচীন সাহিত্যনিদর্শন মাত্রেরই তেমনি একটা তৎকালীন মূল্য এবং কাল-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত প্রকৃত বর্ত্তমান মূল্য আছে, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-কালে আমাদের সেই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পূর্ব্বে কি ছিল এবং শর্ম্মিষ্ঠায় মধুসূদন কি দিয়াছিলেন, তাহা রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্ব্বস্ব এবং শর্ম্মিষ্ঠা একত্র করিয়া পাঠ করিবামাত্রই বোধগম্য হইবে। নিরস্ত-নাট্য-

* জীবন-চরিত—২২ পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-দেশে সহসা রামনারায়ণের নাটকলক্ষণাক্রান্ত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়জনক হইয়াছিল, নিরস্ত-নাটক-দেশে সহসা সর্ব্বাংশে নাটক নামের উপযুক্ত শর্ম্মিষ্ঠার আবির্ভাবও তাহার চেয়ে কম বিস্ময়জনক হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক কিরূপ হওয়া উচিত, বঙ্গসাহিত্যে শর্ম্মিষ্ঠাই তাহার প্রথম উদাহরণ। বঙ্গসাহিত্যে অনুরূপ ঘটনা আর একবারমাত্র ঘটিয়াছিল,—যখন বাঙ্গলা সাহিত্যের উষর কথা-সাহিত্যক্ষেত্র সহসা বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার রূপচ্ছটায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই গেল শর্ম্মিষ্ঠার স্থানীয় মান। কিন্তু কালের পরীক্ষায় শর্ম্মিষ্ঠার প্রকৃত মানও নির্ণীত হইবার সময় আসিয়াছে। কালপরীক্ষক শর্ম্মিষ্ঠার উপর যে নম্বর দাগিয়া দিয়াছে তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠা প্রায় ফেলের কোঠায় যাইয়া পড়িয়াছিল,—কোনক্রমে পাশ হইয়াছে মাত্র। অনেকে যেমন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মনে করে যে, এই সব স্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—এইবার জাগরিত হইলাম,—এবং তাহার পরবর্ত্তী স্বপ্নব্যাপার জাগরণ কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়, শর্ম্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী রচনাকালে মধুসূদনেরও সেই দশা হইয়াছিল। এই উভয় নাটক রচনাই প্রচলিত অনুদিত সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল। উভয় নাটক রচনা করিয়াই মধুসূদন মনে করিয়াছিলেন যে এইবার সংস্কৃত নাটকের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিলাম। কিন্তু এই উভয় নাটকেই দেখা যায় যে, সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পাষাণের মত মধুসূদনের প্রতিভা-উৎসের দ্বার চাপিয়া রাখিয়াছে এবং স্বপ্নাবিষ্টের মত মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের মায়া-মোহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যে রত্নাবলী অভিনয়ে ব্যয় ও আড়ম্বর-বাহুল্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা রচনায় প্রবৃত্ত হন, সে রত্নাবলীর প্রভাবের গোলকধাঁধায় শর্ম্মিষ্ঠা অন্ধের মত পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। আর পদ্মাবতীতে শকুন্তলার অনুকরণ এত স্পষ্ট যে, টুলো পণ্ডিত-রূপী বৃদ্ধদেরে অবাক করা যাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তিনি কিরূপে যে

এরূপ বালকোচিত আক্ষরিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

রসজ্ঞ পাঠককে আরও আহত করে শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী, কৃষ্ণ-কুমারী ও মায়া কাননের ভাষা। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিয়াই যেমন ভোজরাজ বড় বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দৃশ্যকাব্য রচনায় হাত দিয়াই তেমনি তৎকালীন গ্রন্থকারগণ "ভাষা" ছাড়িয়া সংস্কৃতভাঙ্গা বাঙ্গলায় কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন। স্বাধীন-প্রকৃতি মধুসূদনের নিকট হইতে আমরা এই সংস্কৃতের নিগড় ভাঙ্গি-বার শক্তি আশা করিতে পারিতাম, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মধুসূদনের স্বাধীনতা স্ফুর্ত্তি লাভ করে নাই। বেশ-ভূষা কৃত্রিম হইলে খাঁটি মানুষও যেমন কৃত্রিমতার সন্দেহ হইতে মুক্তি পায় না, মধুসূদনের নাটকাবলিরও সেই দশা হইয়াছে।

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলায় মনের ভাব আশ্চর্য্য জীবন্তরূপে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা যে মধুসূদনের ছিল, শর্ম্মিষ্ঠার পরবর্ত্তী রচনা "একেই কি বলে সভ্যতা" পাঠ করিবামাত্র তাহা বোধগম্য হয়। বাষ্পযানে কৌতূহলী দর্শক ইঞ্জিন দেখিতে গিয়া ইঞ্জিনঘরের গরম বাতাসে ক্লিষ্ট হইলে পর জাহাজের সম্মুখ ভাগের সদা প্রবহমান শীতল বাতাসে যাইয়া যে প্রকার আরাম অনুভব করে, শর্ম্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী ইত্যাদির নাটুকে ভাষার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আসিয়া "একেই কি বলে সভ্যতা"র ভাষায় তেমনি শরীর যেন জুড়াইয়া যায়। "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসন বটে, কিন্তু এই প্রহসনেই বঙ্গীয় নাট্যকার প্রথম প্রকৃতিস্থের মত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন,—এই প্রকৃতিস্থতার উদাহরণ ও আদর্শ পরবর্ত্তী নাট্যসাহিত্যে অসীম কার্য্যকারী হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রহসন "সধবার একাদশী" "একেই কি বলে সভ্যতা"র সাক্ষাৎ বংশধর,—অন্ততঃপক্ষে এক গোত্রসম্ভূত যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুত্র যে পিতা অপেক্ষা কৃতী হইয়াছে, তাহা আনন্দের বিষয়; কিন্তু ইহা ঠিকই যে "একেই কি বলে

সভ্যতা” লিখিত না হইলে “সধবার একাদশী” রচিত হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ভাষার কৃত্রিমতা এবং অনুকরণ-বাহুল্যও মার্জ্জনা করা যাইত যদি শর্ম্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতীতে প্রাণ থাকিত—প্রকৃত সাহিত্যরসের বিকাশ থাকিত। কিন্তু তাহা না থাকাতে এই দুইখানা নাটক বহু অশোভন ভূষণ-ভারাক্রান্তা প্রাণহীন পুত্তলিকার মত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদনের নাটকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীতে নাটকীয় রসের এবং সাহিত্য-রসের কথঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা নায়িকা কৃষ্ণকুমারীরই মত বিকশিত হইতে না হইতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী পাঠ করিয়া পাঠকহৃদয় কোনই ভাব-সঞ্চার লক্ষ্য করিতে পারেন না,—পাত্রপাত্রীদের সুখদুঃখ পাঠকের হৃদয় স্পর্শও করে না এবং সাহিত্যানুশীলনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আনন্দরস একেবারে অনাস্বাদিত থাকিয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী পাঠ সমাপ্ত করিয়া হৃদয়ে যে একটি অস্বস্তি অবশিষ্ট থাকে তাহাতেই মনে হয়,—ভ্রূণ-হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল,—বাঁচিল না:—মধুসূদনের নাট্য-চেষ্টা সফলতার পথে পদার্পণ করিয়াছিল, হয় ত সফল হইতে পারিত।

মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় সম্বন্ধে সৌভাগ্যক্রমে এই কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, যে পুত্রের জন্মোৎসব দিগ্দিগন্তে বিঘোষিত হয়, যাহার অন্নপ্রাশন ও হাতেখড়ীতে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়, সে গোমূর্খ, কুলকলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। আর যে-ই ছেলে চির অনাদরের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া আসে, অবশেষে সে-ই বংশের মুখোজ্জ্বল করে। মধুসূদনের নাট্যচেষ্টাগুলি সম্বন্ধেও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়-ব্যাপারে অতুল ধন-সম্পত্তি জলের মত ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, কালের পরীক্ষায় এখনই তাহা বাতিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে যে প্রহসনদ্বয়ের অভিনয় পর্য্যন্ত হওয়া

সম্ভবপর হয় নাই, নাট্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাই মধুসূদনের নাম সজীব রাখিতেছে এবং রাখিবে। "একেই কি বলে সভ্যতা" মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-চেষ্টা এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" তাদৃশ উৎকৃষ্ট বা সুসঙ্গত না হইলেও, ইহাও নিরর্থক রচনা নহে।

মধ্যযুগের অনেক নাট্যকারের নাম বিস্মৃতির অতল জলে এখনই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুগণের চেষ্টায় তাঁহাদের দুই একজনের নাম আমরা পুনরায় শুনিতে পাইতেছি। শ্রীযুক্ত শরৎবাবু কুলীনকুলসর্ব্বস্বের একবৎসর পূর্ব্বে রচিত তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জ্জুন নামক নাটক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ সমদ্দার মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের নাট্যকার দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ১২৭১ সনের ১১ই শ্রাবণ প্রকাশিত বিক্রম-নাটক নামক একখানি নাটকের পরিচয় প্রতিভা পত্রিকায় দিয়াছেন। শরৎবাবুর প্রদত্ত বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সাহিত্যরচনা নিদর্শন হিসাবে ভদ্রার্জ্জুন বিশেষ বহুমূল্য নহে। যোগীন্দ্রবাবুর অনু-গ্রহে প্রাপ্ত একখণ্ড বিক্রমনাটক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ভদ্রার্জ্জুন হইতে অনেক শ্রেষ্ঠতর রচনা হইলেও সাহিত্য-সমালো-চনার সম্মান একখানিও দাবী করিতে পারে না। যাহারা মরিয়াছে, তাহারা জীবনীশক্তির অভাববশতঃই মরিয়াছে,—কাল-পরীক্ষক তাহাদের শেষ সমালোচনা সমাপ্ত করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছে; —তাহাদের প্রেতাত্মাকে পরলোক হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া যোগ্যতরগণের স্থান সঙ্কীর্ণ করা অনাবশ্যক।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার *

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত দানবীর শ্রীযুক্ত রতন তাতা পাটলিপুত্র খনন-নের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হওয়ায়, বিগত ১৯১২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী স্যার্ জন মার্শাল পাটলিপুত্রে আগমন করেন এবং ডাক্তার ডি, বি, স্পুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমরাহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটি স্থান খনন করিতে উপদেশ দেন। ১৯১৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী ডাঃ স্পুনারের তত্ত্বাবধানে প্রথম খনন-কার্য্যারম্ভ হয়। এই খননে পাটলিপুত্র, অশোক ও বৌদ্ধ ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। বিগত বর্ষে (১৯১৪ খৃঃ) ডাক্তার স্পুনার কুমরাহারে (Site no. III) মৃত্তিকা নির্ম্মিত একখানি 'প্লাক' (Plaque measures 41/8" by 35/8" অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত ১৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২৩ হাত ১৪ ইঞ্চি) এক ফিট্ ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকা গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া বোধগয়া মন্দিরের প্রচলিত ইতিহাসকে একটু নাড়াচাড়া দিয়াছেন। মানুষ বহুদিন হইতে যে কথাটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, আজ হঠাৎ সেই সত্যের মূলে কেহ ধাক্কা দিলে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে চায় না। তবে বড় একটা শক্তি আসিয়া যখন নূতন সত্য প্রচার করে, তখন তাহা আজ হউক কাল হউক সকলকেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। একখানি মৃণ্ময় মূর্ত্তি (Plaque) প্রাচীন বোধগয়া

---

* বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধান-সমিতির ত্রৈমাসিক জর্নালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Bodh Gaya Plaque' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ডাঃ স্পুনার ও আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের অনুমতি-ক্রমে প্রকাশিত হইল।

মন্দিরের আকার ও অবয়বের যে অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব বাহির করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। জীর্ণ সংস্কারের বর্ত্তমান মন্দিরটি যে ভাবে ও আকারে দেখিতে পাই, পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত 'প্লাকের' সঙ্গে তাহার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ স্পুনার বলেন কানিংহাম সাহেব ১৮৮০ অব্দে বোধি মন্দিরের সংস্কারের সময় এই 'প্লাক'খানি পাইলে বোধ হয় মন্দিরের মৌলিক গঠন কিরূপ ছিল তাহা ঠিক ঠিক রূপে বুঝিতে পরিতেন। কেবল কানিংহামের সময়েই নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যখনই এই মন্দিরের কোনরূপ সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেই সঙ্গে ইহার স্থাপত্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হুয়েন সাং ইহার গঠন-প্রণালীর যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এক্ষণে মন্দিরের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দে ব্রহ্মদেশবাসিগণের দ্বারা এই মন্দির সংস্কারের সময় ব্রহ্মদেশীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য কতক পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মোট কথা, বিভিন্ন যুগের সংস্কারে ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়া এক্ষণে উহা এক নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

প্লাকখানি বিশেষভাবে পরীক্ষার পর ডাঃ স্পুনার স্থির করিয়াছেন, যেখানে 'ইহা পাওয়া গিয়াছে সেই স্থান একটি গোরস্থানের উপরে অবস্থিত। এই সমাধিস্তূপ পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পর্সিপলিস্ নগরের সম্রাট্ ডরাউস্-নির্ম্মিত হর্ম্যাবলীর অনুরূপ।' এই স্থানে মৃত্তিকাস্তরের এত ঊর্দ্ধে কি করিয়া প্লাকখানি আসিল সে সম্বন্ধে ডাঃ স্পুনার বলেন,—'It must be due to some disturbance of the soil'—ভূকম্প অথবা অন্য কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত ভূস্তরের সহিত প্লাকখানি ঊর্দ্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত ভূমির সন্নিকট ৬ ফিট্ মাটির নীচে কুশান যুগের বহু তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ডাঃ স্পুনার অনুমান করেন 'প্লাকখানা সম্ভবতঃ কুশান যুগের, অন্ততঃ ২য়

অথবা ৩য় শতাব্দের হইবে।' * * * * 'প্লাকের সম্মুখ ভাগ অতি অল্পমাত্রায় সংবৃত-মধ্য (concave), পশ্চাদ্ভাগ কুব্জ-পৃষ্ঠ। পশ্চাদ্ভাগে ধরিবার জন্য দুইটি (সম্ভবতঃ চারিটি ছিল) বাঁট দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রয়োজন ছিল না বলিয়া এই পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত সাদাসিদে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সম্মুখভাগ উৎকৃষ্ট-রূপে সম্পাদিত। ইহার মাঝখানে বোধগয়া মন্দিরের অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীনতম চিত্র অঙ্কিত'।* এই মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

'We see a tall tower-like structure, with four stories or tiers with niches above the main cella, the whole being surmounted by a complete stupa with fivefold hti.'

ডাঃ স্পুনার বলেন, 'বর্ত্তমান প্লাক দেখিয়া বুঝা যায় যে মন্দি-রের চূড়ার গঠনপ্রণালী ঐতিহাসিকসূত্রে ভুল। প্রধান অংশটি আংশিকভাবে অনাবৃত; সুবৃহৎ খিলানের মধ্যপথে সোজাসুজি মন্দিরের দিকে তাকাইলে বুদ্ধদেবের আসীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূল মন্দিরের বাহিরে, প্রধান মন্দিরাংশের দক্ষিণে ও বামদিকে আরও দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে; ইহাদের দেবভাব চতুর্দ্দিকের মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে প্রতিপন্ন হয়। সম্ভ-বতঃ এই মূর্ত্তিই চৈন পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্ত্বের রৌপ্যমূর্ত্তি, কিন্তু ইহার কোনও চিহ্ন এখন আর নাই। বহুমূল্য ধাতু-সংযোগে পবিত্র মূর্ত্তি-গঠন করা ভুল বলিতে হইবে। আরও দূরে এবং উভয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এবং এই সকল বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ঘিরিয়া বিখ্যাত রেলিং বা বেষ্টনী আছে। ইহা সাধারণতঃ

* 'Unquestionably the oldest drawing of this building in existence.'

কুমরাহারে প্রাপ্ত প্লাক।

অশোক-রেলিং বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মৌর্য্যদের সময়ের নয়, বরং তৎপরবর্ত্তী সুঙ্গরাজাদের সময়ের, কিম্বা আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই রেলিং কেবল মন্দিরের পবিত্র অংশটুকু ও আঙ্গিনা ঘিরিয়া আছে। প্রশস্ত প্রাচীর ও সুউচ্চ প্রবেশদ্বার হইতেই ইহার বাহিরের সীমা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার প্লাকের নিম্নভাগে অতি সংক্ষেপে অল্প স্থানের উপর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য দুই চারিটি রেখাপাত থাকিলেও প্রাচীর যে মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত জমিটার বেষ্টনীস্বরূপ তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।'

প্লাকের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, মধ্য বেষ্টনীর প্রবেশ-পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি হস্তী-মূর্ত্তি; ইহার স্থাপত্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে অশোকের অন্যান্য বহু স্তম্ভের সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা যে রাজা অশোকেরই নির্ম্মিত তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শুধু ইহা হইতেই প্লাকের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। চৈন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে বোধগয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মৌর্য্য স্তম্ভের কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই, এমন কি তিনি সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখও করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই উক্ত স্তম্ভটি পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমান প্লাকখানি ন্যূন পক্ষে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের হইবে।

প্লাকে অতি অস্পষ্টভাবে খোদিত অক্ষর হইতেও উপরোক্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। অক্ষরগুলি এতই অস্পষ্ট যে উহা আলোকচিত্রে একেবারেই ফুটিয়া উঠে না। সুঙ্গন রেলিংএর মধ্যে প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে অক্ষরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ স্পুনার উহা পড়িতে পারেন নাই। তবে তিনি অনুমান করেন যে, 'It

is certain even so that the characters are those of the Kharoshthi alphabet. This is indeed an unexpected feature and one which is most suggestive. It is the first epigraph in this Indian form of Perso-Aramaic to be found in Eastern India.'

প্লাকের খোদিত মন্দির-প্রাঙ্গণ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে মন্দির, স্তূপ ও দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দুই একটি পূজারত ব্যক্তি এবং দুই একটি জীবজন্তুর (সম্ভবতঃ হস্তী) চিত্রও অঙ্কিত আছে। মূল মন্দিরের সর্ব্বোপরি আকাশে উড্ডীয়মান চারিটি দেবমূর্ত্তি এই পুণ্যভূমিকে পূজা করিতেছে, এই ভাবে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার নানা মূর্ত্তি অথবা পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরের চিত্র হইতে কোন্‌টি যে কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ প্লাকের শিল্পী চিত্রে ব্যক্তিত্ব অথবা বস্তু নির্দ্দেশের জন্ম প্রয়াস পান নাই। পাটলিপুত্র খননে বোধগয়ার প্লাক কি করিয়া যে আবিষ্কৃত হইল সে সম্বন্ধে ডাঃ স্পুনার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন—'ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অসংখ্য বৌদ্ধযাত্রী পুণ্যক্ষেত্র বোধগয়ায় আসিয়া মন্দিরের 'প্লাক' খরিদ করিয়া দেশে লইয়া যাইতেন।'* 'সম্ভবতঃ তীর্থযাত্রীরা বোধগয়া হইতে ইহা গৃহে আনিয়া থাকিবেন। ইহা নিশ্চয় যে আমাদের খননভূমির সন্নিকটে খৃষ্ট শতাব্দের আদি যুগে কোন বৌদ্ধ-বিহার ছিল

---

* Such plaques as these, although this is an unusually elaborate one, were seemingly manufactured at the various sacred sites and sold to pilgrims, who then brought them to their several homes as souvenirs or mementoes of their pilgrimage.'

এবং সম্ভবতঃ বিহারের কোন ভিক্ষু বোধগয়া হইতে এই প্লাকখানি আনিয়া থাকিবেন।' * ইহাই প্লাকের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শীতে

কে এসে বসেছ হৃদে নিঃশব্দ চরণে
আজি এ দুরন্ত শীতে চঞ্চল দেবতা ?
গগনে পবনে বনে ভুবনে ভুবনে
ফিরেছি তোমার লাগি পাই নাই কোথা।
আপনি দিয়াছ ধরা যদি প্রিয়তম,
রাখিব বাঁধিয়া তোমা হিয়ামাঝে মম॥

শ্রীসন্তোষকুমার রায়।

---

* বর্ত্তমান যুগেও আমরা বহু পুণ্য-স্থানের মন্দির ও দেবতার প্লাক বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি খরিদ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববঙ্গে ধামরাই মাধবের মৃণ্ময় মূর্ত্তি ধনী দরিদ্র সকল হিন্দুর গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

এখনও একটু আছে।

পাঠানেরা তিন চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম ছিল। মোগলেরা দু'শ আড়াইশ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সে কথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম, প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিত,—সে ধর্ম্মের ভাষা পালি, ধর্ম্ম-যাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়; সেই সন্ধির বলে ইংরাজরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেণ্ট রাখেন। হজসন সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেণ্টও হন। তিনিই সবপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতানন্দ 'ধর্ম্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজসন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজসন্ সাহেব বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজসনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জ্জমা দেখিতে পাওয়া

যায় ; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরও বাড়িয়া ওঠে। হজসন সাহেব বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক সংস্কৃত পুঁথি নকল করাইয়া কলিকাতা, পারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধ-পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজসন সাহেব কলিকাতায় যে সকল পুঁথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পীড়া হয় ; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার নাম Nepalese Buddhist Literature। ঠিক এই সময় বেণ্ডল (Bendall) সাহেব, রাইট সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুঁথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি এক বার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি কলিকাতা আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, যাহা বাঙ্গালা বেহার হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাঙ্গালায় কি রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে ত' বোধহয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙ্গা বাড়ীগুলি আছে, বাঙ্গালায় তাও নাই। এই সময় বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্ম্ম-পূজাই হয় ত' বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। তখন ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট সূঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ী ধর্ম্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানৎ করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্ থাক্ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কাল পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের paper-fastener বসান আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাপু, তুমি কি মন্ত্রে ঠাকুর পূজা করিয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কি?' অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল; মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তিকায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥

আবার শুনিলাম মুক্‌সিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন। তিনি বড় জাগ্রত, যে যা মানৎ করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড় রাগী, কোনরূপ ত্রুটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভাল বাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০।১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শূয়ার ও মুর্গীও পড়ে। আগে সামনেই শূয়ার মুর্গী বলি হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুর দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম; গিয়া দেখি সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে; ত্যাকড়ার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ী, শণের

দড়ী, নারিকেল দড়ী প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলান আছে। কেহ কিছু মানৎ করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল—তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিসকরা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল—তারপর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—দু'দিক হইতে পাথর-খানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করি-লাম—দেখিলাম উহাতে একটি বড় কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ Wই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ,—অশ্বত্থ কি বট মনে নাই—গাছের তলায় বিস্তর আস্‌শেওড়ার গাছ। আস্‌শেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্ত্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখিলাম একটি মাটির বেদীর উপর একখানি পাথর বসান। উল্কার পাথরের মত উহা চক্‌চক্ করি-তেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ সিকা হইতে একটি বড় হাঁড়ী পাড়িলেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড় থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারিদিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙ্গুল দিয়া নৈবেদ্যটি

দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল—তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কি করিলেন? নৈবেদ্য দু'ভাগে কাটিলেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্ম্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্ম্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন,—আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা অর্চ্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাও মানৎ করিতে লাগিল। চারিদিকেই বড় বড় ব্রাহ্মণের গ্রাম; ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্ততঃ করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দ্দশাপন্ন ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শূয়ার ও মুর্গী বলির সময় সে আসিত না, মানৎওয়ালারা ছোট জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই—তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজী ৯৩ কি ৯৪ সালে। ৯৮ কি ৯৯ সালে আমি আর একবার যাই। সেবার দেখি ধর্ম্মঠাকুর মাটির বেদীতে আর নাই। তাঁহার নীচে বেশ একটি পরিষ্কার বড় গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা সহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫ নং জানবাজার রোডের ধর্ম্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি

একতলা মন্দির আছে, মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নীচে উঠান আছে; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্ম্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নীচের থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নীচে তিনখানি পাথর, মাঝের খানি একটু ছোট, বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্ত্তি। এই তিনখানির নীচের থাকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জরাসুর—প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ত্রিপদ ও ত্রিশির। ধর্ম্মঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্ম্মঠাকুরের মানৎ করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠাবলির সময় ধর্ম্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্ম্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড় মাংসাশী—তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্ম্মঠাকুরের মানৎ করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন। ধর্ম্মঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। হরি-মোহন বাবুই আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ধর্ম্ম-ঠাকুর যে কেন এ মাতালটাকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব—যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু ওটা মাতালের একশেষ। একদিন একটু মদ কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে আর ওকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে পঞ্চানন্দের পূজা না হওয়ায়, নিজের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষ একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, 'আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ীর দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।'

তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্ম্মমন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদগদ ভাবে বলিলেন, 'সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালায়'। হরিমোহন বাবুর গদগদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দের ষ্ট্রীটেও একটি ধর্ম্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্ম্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

এইরূপ নানা জায়গায় ধর্ম্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে ত' হয় না। অন্যকে ত' বোঝান চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুইজনকেই যে যে স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের বড় বড় মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুঁথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিই, 'যদি হাকন্দ পুরাণ পাও বা ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোন প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।' রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধর্ম্মের মন্দিরে রীতিমত ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে ধর্ম্মের মন্দিরে পূর্ব্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্ম্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না—কেবল ধর্ম্মঠাকুরই আছেন; ধর্ম্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মত। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন—উহার নাম "ধর্ম্ম-পূজাবিধি"। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্ম্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নন, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্ম্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া; ইঁহাদের চেয়ে বড়। ধর্ম্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এককালে ধর্ম্মঠাকুরের খুব বড় মন্দির ছিল। ভাঙ্গা মন্দিরের চিহ্ন এখনও অনেক জায়গায় আছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর; সামনে একটি বড় নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পণ্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম—নিজেই পূজা করেন; তবে পাল-পার্ব্বণে একজন ব্যাকরণজানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্ম্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত 'ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ'। ক্রমে ধর্ম্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল। পূর্ব্বের কুলুঙ্গীতে

অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর একটি কুলুঙ্গী করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্ম্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম্ম, এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তির সহিত ধর্ম্মমূর্ত্তির স্তূপ—আর কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—সঙ্ঘ কোথায় গেল? মহাযানে সঙ্ঘ বোধিসত্ত্ব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই জগত উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্ম্মঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে ময়নায় পূর্ব্বে একখানি পাথর, ধর্ম্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সঙ্ঘও নাই। আছেন কেবল ধর্ম্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুরা শীতলাকে বড় ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন

না। আমাদের এখানেও ধর্ম্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির সেই-খানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোট চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্ত্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু'জনেই মাংসাশী, দু'জনেই মাতাল। বাঙ্গালায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চা-নন্দ বড় মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়া-ছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তার পর ধর্ম্মঠাকুরের চোখ। এখন ত লোকে Paper-fastener দিয়া ধর্ম্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারিদিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর অন্তপর্য্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্দ্ধের উপর চারিদিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্ম্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্ম্মঠাকুরকে পুরাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কি বলিত ? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্ম্মী বলিত এবং আপনাদের ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্ত্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলা-লিপিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাম সধর্ম্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম

সধর্ম্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্ম্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধর্ম্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া গেল। এ ছড়া পড়িলে আরও বোধ হইবে যে ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্ম্মীরা ধর্ম্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্ম্ম-ঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাঁপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমাবিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান ।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হইল্য ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার ।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি ।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইল্য সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা ।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা ।
আপুনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর ।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাথড় পাথড় বলে বোল ।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

শঙ্খের প্রতি

[৺পুরীধামে লিখিত]

তুমি শঙ্খ! সিন্ধুর কুমার, সিন্ধু-গর্ভে জনম তোমার।
পুঞ্জীভূত ফেন-ধবলিমা দিল তব অঙ্গের গরিমা।
তরঙ্গের গতি বিভঙ্গিম তনু তব করিল বঙ্কিম।
উরমির গভীর গর্জ্জন কণ্ঠে তব পাতিল আসন।—
কবে তুমি ছাড়ি' সিন্ধু-বাস লোকালয়ে করিছ নিবাস।
সতী যবে দেবালয়ে পশি' বিগ্রহের চাহি' মুখ-শশী
বাঁধি' ভুজে আনমিত মুখে চুমে তোমা, সনাতন সুখে
চিত্ত তব উঠে উচ্ছ্বসিয়া, কণ্ঠ হ'তে পড়ে উপচিয়া
ব্যোম বায়ু করিয়া অধীর সিন্ধু-গান কি গুরু গম্ভীর!
কভু তুমি কবির হৃদয়ে অন্তর্গূঢ় স্মৃতিপুঞ্জ ল'য়ে
ভাব-তনু করিয়া ধারণ রহ সুপ্ত, ধ্যান-নিমগন।
কবি যবে অন্তরে তাহার অবগাহি' তোমারে আবার
আনে তুলি, অমনি তখন তুল মন্দ্র মধুর ভীষণ,
বিশ্ব তাহে হ'য়ে চমকিত করে পান সে দিব্য সঙ্গীত!—
কভু তুমি প্রলয়ের কালে প্রভঞ্জন জীমূতের তালে
পিনাকীর বিষাণ ভেদিয়া রুদ্র রব তুলহ ধ্বনিয়া।
শঙ্খ-রূপী তুমি হে ওঙ্কার, জলে, স্থলে, গগনে প্রচার!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মায়াবতী পথে

[৩]

কুলিগণের মুখে ভীমতালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে যে চিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভীমতালে উপনীত হইয়া দেখিলাম সেই মানস ভীমতাল হইতে বাস্তব ভীমতাল কিছুমাত্র অপকৃষ্ট নহে। প্রকৃতির এই মধুর ও বিশাল সৌন্দর্য্য-সমাবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আমরা পথক্লেশ একেবারে বিস্মৃত হইলাম। সুবিস্তৃত দীর্ঘ হ্রদ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বে বিরাট পর্ব্বত-শ্রেণী গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে; হ্রদের ধার দিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পরিচ্ছন্ন পথ; পথের ধারে ধারে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য গৃহরাজি; দেখিয়া আমাদের মনে হইল যেন আমরা সহসা কোন সযত্ন-অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

ভীমতালে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিলাম, ভীমতালের ক্ষুদ্র বাজার। দশ পনের খানি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান লইয়া বাজার। কিন্তু প্রত্যেক দোকানেই—বিশেষতঃ বস্ত্র ও শীতবস্ত্রের দোকানে, দেখিলাম ক্রেতার সংখ্যা অল্প নহে। শুধু স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিলে এই সকল দোকানগুলির চলে না। নিকটবর্ত্তী কুড়ি পঁচিশখানি গ্রামের প্রয়োজনীয় পণ্য ভীমতালের এই সকল দোকানগুলি হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আলমোরা এবং কাঠগুদামের যাত্রীগণও এই দোকানগুলির বাঁধা খরিদ্দার।

বাজার অতিক্রম করিয়া আমরা তালের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের এত উপরে এই বিশাল অচপল জলরাশির দৃশ্য

একটু বিচিত্র মনে হইল। সাধারণতঃ পাহাড়ের উপর জলের বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং ধারণা—ঝরণা এবং পার্ব্বত্য নদী লইয়া, অর্থাৎ চঞ্চল, চলন্ত, বেগবান। পর্ব্বতের ক্রোড়ে এই নিবিষ্ট, স্থির জলবিস্তার দেখিয়া মনে হইল মহাযোগীর আলয়ে এই গভীর এবং বিস্তৃত জলরাশিও সেই মহাবৈরাগ্যের একটি কণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যোগনিবদ্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কুলিগণের মুখে শুনিলাম, এই হ্রদের কোন কোন স্থানের গভীরতা এত অধিক যে এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। এ কথা যে ষোল আনা সত্য তাহা বিশ্বাস না করিলেও, হ্রদটি যে ভয়ঙ্কর গভীর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। হ্রদের আনুমানিক পরিধি অন্যূনাধিক দেড় মাইল মনে হইল। ইহার অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া হ্রদের অপর দিকে ডাকবাংলায় আমরা উপনীত হইলাম। ডাকবাংলা যাইবার জন্য একটি সেতু অতিক্রম করিতে হয়। হ্রদ হইতে ইচ্ছামত জল বাহির করিয়া নিম্নপথে প্রেরণ করিবার জন্য এই সেতুর নীচে একটি ব্যবস্থা আছে। আমরা দেখিলাম সেই পথ দিয়া অল্প অল্প জল বাহির হইয়া অতি দ্রুতগতিভরে নীচে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহা হইতে এমন প্রবল কল্লোলধ্বনি উঠিতেছে যে একমিনিট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই গর্জ্জন শুনিলে মনে হয় যে চাহিয়া দেখিব হ্রদের সমস্ত জল নির্গত হইয়া গিয়াছে।

ভীমতাল সমুদ্র-স্তর হইতে ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ। স্থানীয় ডাকবাংলাটি ক্ষুদ্র নহে বটে, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন মনে হইল। আসবাবপত্রগুলিও অভগ্ন এবং মজবুত নহে। কিন্তু স্থানটি অতিশয় মনোরম এবং আরামপ্রদ। একটি উচ্চ পাহাড়ের শিখরে সমতল ক্ষেত্রের উপর বাংলাটি নির্ম্মিত—চতুর্দ্দিকে খোলা জায়গা, নিম্নে তালের শান্ত জল-বিস্তারের সুন্দর দৃশ্য এবং তাহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া ভীমতালের ত্রি-চতুর্থ অংশ একটি পরিচ্ছন্ন চিত্রের মত দৃশ্যমান। আমরা বাংলা-প্রাঙ্গণে গাছতলায় আমাদের ডাণ্ডিগুলিকে চেয়া-

রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বসিয়া বসিয়া নিমজ্জিত মনে এই সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলাম।

নাইনিতালের কোন কোন স্থান হইতে ভীমতালের হ্রদ দেখা যায়। কুলিগণ নাইনিতালের পাহাড় আমাদিগকে দেখাইয়া দিল—কিন্তু সেইটি যে নাইনিতালেরই পাহাড় সে বিষয়ে কুলিগণের কথা ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ভীমতালের সুন্দর দৃশ্যের উপর শেষবার চক্ষু বুলাইয়া আমরা যখন অগ্রগামী হইলাম তখন বেলা প্রায় ৩টা।

কাঠগুদাম হইতে ভীমতাল আট মাইল পথ। ভীমতাল হইতে আমাদিগকে যাইতে হইবে রামগড়, এগার মাইল পথ; এবং সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে আমরা রামগড়ে পৌঁছিতে পারিব সে বিষয়ে দুরাশাও তখন আর কাহারও মনে ছিল না। তবে আশ্রয়স্থলে পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়া না পড়ে, সেই জন্য আমরা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিভরে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এবং উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া সন্ধ্যা যখন তাহার আঁধার অঞ্চলের আবরণে চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল, তখনও রামগড়ের প্রায় তিন মাইল পথ বাকী। তাহার উপর আমাদের ডাণ্ডিওয়ালাগণের মধ্যে দুই জনের জ্বর আসায়, দুইখানি ডাণ্ডির, কাজে কাজেই সকল ডাণ্ডিগুলিরই গতি মন্থর হইয়া পড়িল। আমাদের পক্ষ হইতে তাড়নার ও উৎসাহ-উদ্দীপনার বিরাম ছিল না, কিন্তু তত্রাচ রাত্রি ৮ টার পূর্ব্বে আমরা রামগড়ে উপনীত হইতে পারিলাম না।

ডাকবাংলায় উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল পীড়িত ডাণ্ডিওয়ালা ও কুলিগণের চিকিৎসা করা। কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমাদের সহিত ছিল—সেগুলির সহিত ও পীড়ার লক্ষণের সহিত যথাসম্ভব ও যথাশক্তি মিলাইয়া দেখা গেল একমাত্র বেলেডোনাই প্রযুজ্য। জ্বর ও তাহার সহিত প্রবল মাথাধরা ইহাই

পীড়ার প্রধান লক্ষণ; এবং আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই হউক বা মহাত্মা হ্যানিম্যানের স্বর্গস্থিত আত্মার সৌভাগ্যবশতঃই হউক, চারিজন রোগীর ঠিক একই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। চারিজনকেই এক এক কৌটা করিয়া বেলেডোনা সেবন করিতে দিলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া সংবাদ পাইলাম চারিজনই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছে। চিকিৎসার এরূপ সন্তোষজনক রিপোর্ট পাইয়া আমাদের মধ্যে কয়েকজন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতার সপক্ষে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হোমিওপাথগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন, হোমিওপ্যাথীর আমি একজন দৃঢ় অনুরাগী হইলেও, বর্ত্তমান ব্যাপারের বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নহি; আমার মনে প্রবলভাবে সন্দেহ হয় যে বেলেডোনা না দিয়া ভেরাট্রম দিলেও ঠিক একই প্রকার ফল পাইতাম। ঔষধ খাইয়া আরোগ্য হইবার জন্য যাহাদের দেহ ও মন ষোল আনা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ঔষধ খাইলেই আরোগ্য হইব এইরূপ বিশ্বাসের সঞ্জীবনী কবচ ধারণ করিয়া যাহারা আরোগ্যের অর্দ্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের পক্ষে, আমার মনে হয়, কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বেলেডোনা ও ভেরাট্রমের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আমার এ ধারণা যে ভিত্তিহীন কল্পনা নহে তাহার পরিচয় পরে দিব।

রামগড় সমুদ্র-স্তর হইতে ৬০০০ ফিট্ উচ্চ এবং ভীমতাল হইতে এগার মাইল দূর। এখানকার ডাকবাংলাটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবপত্রগুলিও ভাল। এই রামগড়ে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল অন্ততঃ দূর হইতে একবার কবির আলয় দর্শন করিয়া আসিব। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ করিবার জন্য ডাকবাংলা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী চটি পিউড়ার জন্য যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। সকাল সকাল আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা পিউড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

রামগড় হইতে পিউড়া পথের দৃশ্য অতি মনোরম। এই পথের একটি জায়গায় একটি বৃহৎ ঝরণা, আমাদের পথের পাশে পাশে বহিয়া চলিল। এত বড় ঝরণা অতি অল্পই দেখিয়াছি—একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী বলিলেও চলে। বহুক্ষণ ধরিয়া এই তন্বী স্রোতস্বিনীটি কৌতুকপরায়ণা সহচরীর মত বিচিত্র রঙ্গে আমাদিগকে পথশ্রান্তি হইতে অন্যমনস্ক রাখিয়া আমাদের পাশে পাশে বহিয়া চলিয়াছিল। কোথাও নববধূর মত মৃদুভাষিণী, কোথাও যুবতীর মত কলকল্লোলা, কোথাও কুপিতার মত গর্জ্জনকারিণী এবং কোথাও বা অভিমানিনীর মত অবগুণ্ঠিতা। এই নিকটে, এই দূরে, এই পার্শ্বে, এই পশ্চাতে, এই সম্মুখে, এই অন্তরালে, এইরূপে নানাভাবে আমাদের কৌতুক উৎপাদন করিতে করিতে সহসা এক সময়ে অপর একটি নির্ঝরিণীর সহিত মিলিত হইয়া অন্য পথে সরিয়া পড়িল। এই দুইটি নির্ঝরিণী মিলিয়া যেখানে ত্রিসঙ্গম হইয়াছে, তাহার উপর একটি সুদৃশ্য লৌহ-সেতু। সেই লৌহসেতুর উপর হইতে এই দুইটি গিরিনির্ঝরিণীর অপূর্ব্ব ক্রীড়া কিছুক্ষণ উপভোগ করিয়া আমরা গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইলাম।

অল্পক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর সহসা এক সময়ে আমাদের চক্ষের সম্মুখে চির-তুষারের স্নিগ্ধ অমল কমনীয় শোভা আমাদিগকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে তুষার এই প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল; এবং এখন হইতে আরম্ভ করিয়া মায়াবতী পৌঁছান পর্য্যন্ত যতবার আমাদিগের বাম দিকে আমরা চাহিয়া দেখিয়াছি, অকপট বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যের মত এই অমল ধবল তুষারশ্রেণী ততবারই আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছে। লঘুপ্রকৃতি নির্ঝরিণীর মত অকস্মাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।

বেলা ১টা আন্দাজ আমরা পিউড়ায় উপনীত হইলাম। সমুদ্র-স্তর হইতে পিউড়ার উচ্চতা ৫৯০০ ফিট্ এবং রামগড় হইতে দূরত্ব দশ

মাইল। অর্থাৎ দশ মাইল পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ অবরোহণ করিতে করিতে পিউড়ায় উপনীত হইয়া আমরা দেখিলাম, রামগড় হইতে ১০০ ফিট্ আমরা নামিয়াই আসিয়াছি। পিউড়ার ডাক-বাংলায় পৌঁছিয়া ডাক-বাংলার সম্মুখের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমরা চিত্রার্পিতের মত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে প্রায় আট দশ মাইল বিস্তার করিয়া গভীর গহ্বর, তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উচ্চ পর্ব্বতমালা, সেই পর্ব্বতমালার গাত্রে একদিকে আলমোরা সহরের গৃহগুলি চিত্রাঙ্কিতের মত দেখা যাইতেছে—এবং সেই পর্ব্বতমালাকে অতিক্রম করিয়া পশ্চাতে তুষারগিরি বিচিত্র চূড়া শৃঙ্গ প্রভৃতি বহন করিয়া গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে মণ্ডিত হইয়া এই দীর্ঘ এবং উচ্চ তুষারশ্রেণী একটি রূপার রাজ্যের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। অক্ষম লেখনীর দ্বারা সে অসীম সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহার মহত্বকে খর্ব্ব করিব না। আমার প্রবন্ধ-পাঠকগণের মধ্যে যিনি কখন পিউড়া হইয়া আলমোরা প্রভৃতি অঞ্চলে যাইবেন, তাঁহার প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ, এই সুন্দর মধুর বিশাল পিউড়াকে অবহেলা না করিয়া অন্ততঃ এক-দিনেরও জন্য ইহার সৌন্দর্য্যরস-ধারায় স্নাত হইয়া তৃপ্ত হইয়া যাইবেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আলমোরায় পৌঁছাইবার আমাদের সংকল্প ছিল—কিন্তু সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একদিন পিউড়ার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য আমরা সকলেই একমত হইলাম।

বাংলার প্রাঙ্গণে এবং চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য চিড়বৃক্ষের শ্রেণী। চিড়গাছের বাঙ্গলা নাম কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না—সংস্কৃত ভাষায় ইহার কি নাম তাহাও অবগত নহি। ইহার ইংরাজী নাম পাইন। এই পাইন গাছের হাওয়া যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। আলমোরায় এবং আলমোরা অঞ্চলে পাইন বৃক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আলমোরায় যে এত অধিকসংখ্যক যক্ষ্মারোগী

আসিয়া বাস করে, পাইনবৃক্ষের আধিক্য তাহার অন্যতম কারণ।

পাইন গাছের তলায় সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া আমরা প্রকৃতির মধুর লীলা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ আমরা এইরূপে বসিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই—সহসা এক বিকট আর্ত্তনাদে আমরা সচকিত হইয়া উঠিলাম। ডাক-বাংলার সংলগ্ন একটি ডাকঘর ও মুদীখানা আছে, সেইদিক হইতে এই আর্ত্তনাদ আসিতেছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য দশগুণ বাড়িয়া উঠিল। একটি কুড়ি-বাইশবর্ষীয় যুবককে ধরিয়া কয়েকটি লোক ইচ্ছানুরূপ প্রহার করিতেছে এবং সেই বলিষ্ঠ ও সবল যুবকটি প্রহারের অনুপাতে দশগুণ অধিক মাত্রায় চীৎকার করিতেছে, তাহার তারস্বর—পর্ব্বতে হইতে পর্ব্বত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া একটি বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। অনতিদূরে একটি ষোল সতের বৎসরের বালিকা হস্তের মধ্যে মুখাবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া। এই করুণ এবং ভীষণ দৃশ্যের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে, সেই বলিষ্ঠ এবং পুষ্ট যুবকটি তাহার আকৃতি অনুযায়ী চোরও নহে, ডাকাতও নহে, গুণ্ডাও নহে—সে একটি নিরীহ প্রেমিক! এবং সেই করমুখাবৃতা ব্রীড়াব-গুণ্ঠিতা অনুতাপমজ্জিতা কিশোরীটি তাহার উপাস্য বস্তু! উভয়ের মধ্যে পরাক্রান্ত প্রেম যখন প্রবল বিক্রমে সংযমের কঠিন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে, প্রেমের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রণয়পথের এই দুইটি পথিক গুপ্তপথ অবলম্বন করিয়া গ্রামান্তরে গিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়। কিন্তু এই দুঃখকষ্টময় সংসারে মন্দলোকের অভাব নাই—সেই কারণে নিশ্চিন্ত হইবারও উপায় নাই। গ্রামের কয়েকটি পরসুখকাতর হিংসাপরায়ণ লোক মিলিয়া প্রেমের নিভৃত নিকুঞ্জ মথিত করিয়া এই যুগল প্রেমিককে ধরিয়া আনিয়াছে এবং পঞ্চা-য়তের সম্মুখে তাহাদিগকে উপস্থাপিত করিয়া বিচারের পূর্ব্বেই

তাহাদিগকে শাস্তি দিতেছে। এই করুণ এবং কঠোর দৃশ্যের মধ্যে যে কৌতুকেরও একটি সূক্ষ্ম ধারা লুকায়িত ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। এই অদূরদর্শী প্রেমিকটি ধারণা করিতে পারে নাই যে রোমান্সের অব্যবহিত পিছনে এমন একটি ক্লেশজনক ঘটনার সংযোগ থাকিতে পারে—ধারণা করিলে হয় ত গুপ্তপথ অবলম্বন না করিয়া সে ভিন্নপথ অবলম্বন করিত। আমাদিগকে দেখিয়া বেচারী প্রেমিকটি দুর্বৃত্তগণের নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু অবসর বুঝিয়া পঞ্চায়েতের মোড়ল বিশদভাবে হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা এবং ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। সেই বক্তৃতার দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিবারও কতকটা উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু সেই পার্ব্বত্য হিন্দির ষোল আনা মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সেই রূপার রাজ্য অস্তমান সূর্য্যের কিরণে মণ্ডিত হইয়া একেবারে সোণার রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা বিমুগ্ধ হইয়া সেই অসীম সৌন্দর্য্যের ধারা পান করিতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন ভাব! কখন পীত, কখন পীতাভ, কখন রক্তিম, কখন রক্তাভ, কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও কমনীয়—এইরূপে একঘণ্টা ধরিয়া আমরা বিধাতার সেই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনশীল জীবন্ত চিত্র নিরীক্ষণ করিলাম। তাহার পর সেই উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি যখন ক্রমশঃ রক্ত হইতে পীত এবং পীত হইতে নীলাভ হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকারের গুপ্ত ক্রোড়ে মিলাইয়া আসিতে লাগিল, তখন আমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত ও বহন করিয়া ডাকবাংলায় উঠিয়া আসিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে চা পান করিয়া সুন্দর কমনীয় পিণ্ডারার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা আলমোরার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারীর অধিকার

বিগত কার্ত্তিক মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'নবদ্বীপে মাতৃমন্দির' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"তুমি সমাজ—তুমি ত শুধু পুরুষের সমাজ। পুরুষ সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসাতে ডুবিয়া-ভাসিয়াও তোমার মধ্যে মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তোমার যত শাস্তি, যত নির্য্যাতন, দুর্ব্বল নারীর উপর।"

আরও একস্থলে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তুমি সমাজ যতই চোখ রাঙ্গাও না কেন, আমি জোর করিয়া বলিব, ইহা তোমারই সৃষ্টি; তোমার বিধি, তোমার ব্যবস্থা, তোমার প্রথা, অনুশাসন—ইহারাই এই সকলের মূল।"

বাস্তবিক দুর্ব্বল নারীর উপর সমাজ কোন নির্য্যাতন করিতেছে কি না, পুরুষের পক্ষে সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসায় ডুবিয়া থাকিয়া মাথা উন্নত করিয়া থাকিবার অধিকার আছে কি না এবং সমাজই বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করিয়া এই সমস্তের সমর্থন করেন কি না—তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অধুনা আমাদের নব্য সমাজের তেমন কোন ক্ষমতাই নাই যে নূতন করিয়া বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া নারীর নিপীড়ন করিবে। নারীর নির্য্যাতন জন্য নব্য সমাজের কোন বিধিনিষেধ যে এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই—তাহা সকলেই জানেন। তথাপি সমাজে যদি নারী-নির্য্যাতন হয়, তবে তাহা প্রাচীন সমাজের বিধি, নিষেধ, অনুশাসনের ফলেই হইয়াছে, বলিতে হইবে। এবং পুরুষের পাপলালসায় ডুবিয়া থাকিয়া মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইবার অধিকারেরও যে প্রাচীন সমাজ বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাও মানিতে হয়।

কথা যখন এই, তখন সমাজের পুরাতন পুঁথি ঘাঁটিয়া, ইতি-

হাসের ধারা বাহির করিয়া—অবশ্য নজির বাহির করা—তেমন শক্ত কথা নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে। পল্লব-গ্রাহী পাণ্ডিত্যের ফলে—দুই একখানা স্মৃতি-সংহিতার বাঙ্গলা অনু-বাদ দেখিয়া এবং পরের মুখে ঝাল খাইয়া অনেক মীমাংসা করা যায় বটে; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি লইয়া আলোচনা করিতে বসিলে অনেক সত্য বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের আধুনিক সমাজে এমন কতকগুলি কুসংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, সমাজের কোথাও একটা কোন কিছু দুর্ব্বলতা দেখা গেলে সেটাকে হিন্দুজাতির একটা প্রকাণ্ড অনুদারতার ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিশেষতঃ হিন্দুজাতির বিশেষত্বের ও উদার সমাজ-তত্বের কষ্টিপাথরে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘসিয়া মাজিয়া না লইয়া একটা আজগুবী যাহা-হউক-সত্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং পাশ্চাত্য অপরিপুষ্ট অগঠিত সমাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া—যাঁহারা একটা বিরাট্ মতবাদ চালাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে গোড়ায় মস্ত ভুল করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভুলের ফলেই একটা প্রবল জিজ্ঞাসাও যেন অনবরত চারিদিকেই ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সেই জিজ্ঞাসার আপূরণকল্পে সমাজেরও যে সাড়া পাওয়া যাই-তেছে না—তাহা নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসার উপযোগী এখনও সমগ্র উত্তর প্রস্তুত হইয়া না উঠিলেও এবং যদিবা সেই উত্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদুপযোগী চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোক প্রস্তুত হইয়া না উঠিলেও তদ্বিষয়ক আলোচনা মন্দ কি?

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন নারীর শৈশব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের আলোচনা করা যাইতে পারে।

পুরুষ ও নারী সমাজের নিকট তুল্যাধিকার পাইবার যোগ্য কি না, এবং পুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা নারীর পক্ষে সম্ভব কি না, এবং পুরুষের চিত্তবৃত্তির মত নারীর চিত্তবৃত্তি ঠিক একই উপা-

দানে গঠিত কি না, তাহা লইয়া বিচার করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় অনেকটা আলোচনা সহজ হইয়া আসে। পুরুষ যে জিনিসটা ভালবাসে, পুরুষের প্রকৃতিতে যে বস্তুটা ঠিক খাপ খায়, পুরুষের চিত্তবৃত্তি যতটা গ্রহণ করিবার উপযোগী, হয় ত নারী চরিত্র তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এস্থলে উভয়ের ওজন বুঝিয়া অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিলেই সমাজে তুল্যাধিকার দেওয়া হয়। পুরুষ দশ ক্রোশ হাঁটিতে পারিলে নারীর পাঁচ ক্রোশ হাঁটার শক্তির সঙ্গে তুল্যাধিকার। দশ ও পাঁচ সমান না হইলেও, হাঁটার পরিমাণগত শক্তিটা কিন্তু উভয়ের সমান। এই জন্য এই দিক দিয়া স্ত্রীপুরুষের অধিকার ঠিক রাখা কর্ত্তব্য। সংসার-ধর্ম্মটার ভিতরও এই দিক দিয়াই স্ত্রীপুরুষের অধিকার বিবেচনা করিতে হয়। আজকাল ইহা একবাক্যে অনেক পাশ্চাত্য সুধীগণও স্বীকার করেন যে, পুরুষপ্রকৃতির সহিত নারীপ্রকৃতির পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে বলিয়াই পুরুষের কর্ত্তব্যের সঙ্গে নারীর কর্ত্তব্যের বৈষম্য বিধি-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। এই বৈষম্যই বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষের সাম্যের ও তুল্যাধিকারের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠে। এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আছে বলিয়াই যত বিরোধ, যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যত অনর্থ, এক-কথায় ভারতীয় সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এখন-কার কথা স্বতন্ত্র। আমরাও এই অধিকার বিচারের ভিতর দিয়াই নারীজীবন আলোচনা করিব।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা ॥"

এই বচনে শৈশব-কালে নারীর লালন পালন ও শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য নারীর এই শিক্ষা পুরুষের সহিত জ্যামিতি পরিমিতি বা ভূগোল ইতিহাসের সঙ্গে সমান না হউক—তাহার অন্তঃকরণের উপযোগী—তাহার ভবিষ্য

জীবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইত। এখানেও সেই অধিকারের কথা।

তারপর—

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধবশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভৈক্ষ্যচর্য্যা চেতি। সদ্যোবধূনাং উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ।" (হারিত)

এই বচনে অধিকার হিসাবে নারীর মধ্যে দুই রকম ভাগ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী হইবার অধিকার লাভ করিতেন, তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি পুরুষোচিত সমস্ত কর্ত্তব্যজাতই করিতে পারিতেন; যাঁহাদের সেরকম অধিকার ছিল না, তাদৃশ নারীগণের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা, এবং বেদে অনধিকার বলিয়া যে একটা কথা আছে—তাহারও ব্যবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে নারীর বেদাধ্যয়ন কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিণী এবং সহধর্ম্মিণী। বেদনির্দ্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে যখন সংসারী মানবের কর্ত্তব্যতা আসিয়া পড়ে, তখন স্ত্রীপুরুষে পৃথক্ ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি করিলে, ধর্ম্মাচরণের দ্বৈবিধ্য আসিয়া পড়ে। পুরুষের একটা ধর্ম্ম এবং নারীর একটা আলাহিদা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নারী আর পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সংসারের কর্ত্তব্যরাশির ভিতরে স্ত্রীপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিধিব্যবস্থা থাকিলে দুইটা আলাহিদা সংসারই গড়িয়া উঠে। এইজন্য স্ত্রীর বেদে অধিকার থাকিলেও স্বাধীনভাবে অধিকার নাই। বেদ বলিলে শুধু গ্রন্থখানা পড়া বুঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের কথাও আসিয়া পড়ে। কাজেই

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যু পোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে।।"

এই মনুর বচনটা আসিয়া পড়ে। এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে

যে পুরুষের সঙ্গে নারীর এই যে বৈষম্য তাহা অনুদারতার ফল নহে—অধিকারেরই সুন্দর ফল। কাজে এখানেও 'স্ত্রীণাং' বলিতে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর কথা বলা হয় নাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবাদিনী-দের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই জন্যই সেদিনকার—"ন্যায়প্রকাশে"র টীকাকার ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"আত্রেয্যাদীনামিব যাসাং স্ত্রীণাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জায়তে তাসা-মুপনয়ন-বেদাধ্যয়নাদাবধিকারাৎ যাগেঽপি স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারঃ।"

(ন্যায়প্রকাশের টীকা।)

এই জন্যই ভবভূতির উত্তরচরিতে "আত্রেয়ী"র বেদান্ত পড়ার কথা পাই। এবং সীতা সাবিত্রীদের ন্যায় নারীগণের বধূ হওয়ার কথাও রামায়ণ মহাভারতে পাওয়া যায়। বধূজীবনে নারীগণের এই যে পতিশুশ্রূষা, ইহার মধ্যে দাস্যবৃত্তির একটা উৎকট কল্পনা অনেকে করিতে পারেন বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে সে কথা মনে আনাও অন্যায়। মনুতেও—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে" বলিয়া নারীপূজারও বিধান দেখা যায়। ফল কথা, পতিশুশ্রূষা বা নারীপূজার অর্থ এমন নহে যে দাসী দাসের ন্যায় জীবন যাপন করার বিধি দেওয়া হইয়াছে। পরস্পর শ্রদ্ধাপ্রীতিই এই বচনদ্বয়ের তাৎপর্য্য। তথাপি পাতিব্রত্যহিসাবে নারীর অধিকারের মধ্যে একটু নম্রতা থাকিলেও তাহাতে কিছুই অপমানের বিষয় নাই। দেবতার উপাসনায়, পিতৃভক্তিতে বা গুরুভক্তিতে মানবের যেমন অপমানের কথা দূরে থাকুক সম্মানের কথাই পাওয়া যায়, এখানেও পতি-দেবতার শুশ্রূষায় তেমনি অপমানের কথা কেন আসিবে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই উচ্চনীচতাই এখানে স্ত্রীপুরুষের ভিতরে অধিকারের সমতা আনিয়াছে। এই জন্যই পুরুষের কার্য্যের সঙ্গে নারীর কার্য্যের তুল্যাধিকার দেখিতে গেলে উভয়ের দিক্ দিয়াই দেখিতে হয়। সন্তানপালন হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহক্ষেত্রের উপযোগী নারীর সমস্ত

কার্য্যাবলির সঙ্গে পুরুষের কঠোর কর্ম্মজীবনের অধিকারের পরিমাণটা ভাষার দিক্ দিয়া না দেখিয়া বিবেচনা করিলে কোন জায়গায় বৈষম্য পাওয়া যায় না। এখানে নারী অফিসে চাকুরি করিয়া সংসার পালনের, বা বাগানে কোদাল পাড়িয়া গাছপালা রোপণ করিয়া কঠোর কর্ম্মরাশির, পুরুষের সঙ্গে কেন সমান অধিকার পাইবে না, একথা তুলাই অন্যায়। দুই জনেই পুরুষ হইলে, একের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। নারী নারীই থাকিবে, কদাপি পুরুষ হইবে না, এবং পুরুষও কদাপি নারী হইবে না। উভয়ে পরামর্শ করিয়া কর্ম্মের ব্যতিক্রম করিলে নিজের নিজের অধিকার হারাইবে। অবশ্য সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া কোন দিন যদি পুরুষকে নারীর কর্ম্ম করিতে হয়, এবং সময়বিশেষে নারীকেও পুরুষের কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতে অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমাদের সমাজেও এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তের কথা ধরিয়া এই অধিকার-পদ্ধতির প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নহে। পাশ্চাত্য সমাজ এই অধিকার-পদ্ধতি মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সংসারধর্ম্ম এই অধিকার-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়াই সেখানকার মানবজীবনের কোন্ সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্যই ভগবান্ মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

> হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোহভিচারো মূলকর্ম্ম চ।
> ইন্ধনার্থমশুষ্কানাং দ্রুমাণামুপপাতকম্॥

অর্থাৎ 'অপক্ক অবস্থায় ধান্য নাশ করা, স্ত্রীদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা, পরহিংসার্থ জপহোমাদি কর্ম্ম করা, এবং বশীকরণাদি কার্য্য করা, এবং কাষ্ঠের নিমিত্ত অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন করা, প্রত্যেকটাই উপপাতক।'

উক্ত বচনে স্ত্রীদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহও যে একটা পাপ তাহা

স্পষ্টই বুঝা যায়। এখানে যেমন একদিকে স্ত্রীর অধিকারের সম্মান দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে পুরুষকে তাহার অধিকারের হিসাবটাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে পাপের দণ্ডের ভিতর দিয়াও স্ত্রীপুরুষের অধিকারটা দেখা যাউক।

"অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালোবাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ॥"

অর্থাৎ 'অশীতিবর্ষের অন্যূনবয়স্ক বৃদ্ধ, ষোড়শবর্ষের ন্যূন বালক সাধারণ স্ত্রী এবং রোগীদিগের সম্বন্ধে অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত অনুগ্রহ করা যাইতে পারে।'

"স্ত্রীণামর্দ্ধং প্রদাতব্যং বৃদ্ধানাং রোগিণাং তথা।
পাদোবালেষু দাতব্যঃ সর্ব্বপাপেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

(লঘুবিষ্ণু)

এই বচনেও সমস্ত পাপেই স্ত্রীদিগের অর্দ্ধদণ্ড বিহিত হইয়াছে। পুরুষের পূর্ণদণ্ডের সঙ্গে স্ত্রীদিগের এই অর্দ্ধদণ্ডের সাম্য আছে। পুরুষের হাতেই ত ব্যবস্থা তৈয়ারীর ভার ছিল, পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে কি নিজের কোলের দিকেও ঝোল টানিতে পারিতেন না?

এ ত হইল সাধারণ পাপের কথা—এখন ব্যভিচারের দিক দিয়াও নারীদিগের দণ্ডের হিসাবটা দেখা যাউক।

"বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেক-বেশ্মনি।
যৎপুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্‌ব্রতম্॥"

(মনু)

অর্থাৎ "যেস্থলে যে স্ত্রীগমন করিলে পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে সেই পুরুষগামিনী স্ত্রীরও সেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এবং ভর্ত্তা সেই

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অঙ্গসংস্কার করিতে দিবেন না, এক ঘরে সেই স্ত্রীর সহিত থাকিয়া প্রাণধারণের মাত্র উপযোগী তাহাকে আহার দিয়া ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।”

এস্থলে পুরুষের ব্যভিচারের সঙ্গে নারীর ব্যভিচারও যে সমান পাপজনক, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়—“তুমি ত সমাজ শুধু পুরুষের সমাজ” বলিয়া সমাজকে গালি দিয়াছেন, কিন্তু কথাটা তাঁহাকে এইবার ভাবিয়া দেখিতে বলি।

“হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্॥”
ব্যভিচারে ঋতৌ শুদ্ধির্গর্ব্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ব্ভভর্ত্তৃবধাদৌ তু তথা মহতি পাতকে॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য)

এই বচনে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন হইলে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি ব্যভিচার করা হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে না, ইহা বুঝা যাইতেছে—এ সম্বন্ধে প্রমাণও আছে। অবশ্য পরপুরুষের দ্বারা উৎপাদিত গর্ভ-স্থলে সামাজিক হিসাবে গুরুতর অপরাধ করা হয়, এইজন্য তাহাকে ত্যাগ করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। এই সব স্থলে যে ব্যভিচারের কথা বলা হইল, তাহা উত্তমবর্ণের সঙ্গে ব্যভিচার স্থলেই বুঝিতে হইবে। কারণ,—

“চতস্রস্তু পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যগা গুরুগা তথা।
পতিঘ্নী চ বিশেষেণ জুঙ্গিতোপগতা চ যা॥”

(অঙ্গিরাঃ।)

অর্থাৎ চারিটি অপরাধ করিলে মাত্র স্ত্রী পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে,

সেই চারিটি অপরাধ এই—শিষ্যগমন, গুরুগমন, পতিহত্যা, এবং কুৎসিত-হীনবর্ণগমন। অবশ্য এই সব স্থলে নারী যদি স্বেচ্ছাক্রমে অনুরাগ-বশে হীনবর্ণ গমন করে তবেই সে পরিত্যাজ্যা, বলপূর্ব্বক উপভুক্তা হইলে পরিত্যাজ্যা নহে।

> "বলাৎ প্রমথ্য ভুক্তা চেৎ দহ্যমানেন চেতসা।
> প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাত্তস্যা পাবনং পরম্॥
> ব্রাহ্মণ্যাঃ শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে।
> চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ তদস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্॥
> চাণ্ডালং পুক্কসং ম্লেচ্ছং শ্বপাকং পতিতং তথা।
> এতান্ গত্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং পরম্॥"
>
> (সম্বর্ত্ত)

এই সমস্ত বচনের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, নারী যদি ভিন্ন-ধর্ম্মী যবন ম্লেচ্ছাদি কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বকও উপভুক্তা হয়, তবেও সে পরিত্যাজ্যা নহে। অধমবর্ণের দ্বারা বলপূর্ব্বক উপভোগের কথা ত ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। পুরুষেরাও মহাপাতকাদি বৃহৎ পাপ করিলে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন। নারীদের প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ নির্য্যাতনেও পক্ষপাত নাই, কারণ পুরুষেরাও নিজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আজকাল আমাদের সমাজে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সম্বন্ধে বড় নির্দ্দয় ব্যবহার করা হয়—ইহা মানি। অনেকস্থলে যে একটা কুসংস্কারও এই নির্দ্দয় ব্যবহারের কারণ নহে—তাহাও নহে। কিন্তু অনেক স্থলেও যে এই নির্দ্দয় ব্যবহারের ফলে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা কম হয়—তাহাও বুঝা যায়। ইহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষেরা ব্যভিচার করিলে আজকাল আর কোন দণ্ড পায় না। পায় না বলিয়াই পুরুষের মধ্যে ব্যভিচরিতের সংখ্যা বেশী। পুরুষেরা যে পাপ করিয়াও দণ্ড পায় না, তাহা তাহাদেরই স্বয়ং-কৃত

সমাজের প্রতি অবজ্ঞারই বিষময় ফল। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বিধিব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়া যাহারা সর্ব্ববিষয়ে স্বৈরাচার করিবে, তাহারা ত নিজেদের বেলায় পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখিবে না—এই সমস্ত স্বেচ্ছাচার পুরুষের দ্বারাই নারী-নির্য্যাতন যত বেশী হয়, "গোঁড়া" নামধারী পুরুষের দ্বারা তত হয় না। কারণ তাহারা নিজেরাও সমাজকে মানে—নারীদিগকেও মানাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বেচ্ছাচার পুরুষেরা ত তাহা করে না, তাহারা ত নারীর একটু এদিক ওদিক সহিবে না।

আমাদের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর অবজ্ঞার ফলে আমাদের সমাজের অনেক স্থলেই ইংরাজি আইন ঢুকিয়াছে, ইংরাজি আইনের আমলে আসিয়াও আমাদের সমাজের আইনগুলি অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে হইয়াছে এই—পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারের পথ পাইয়াছে, নারীরা পায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা সমাজগত বৈষম্যও আসিয়া পড়িয়াছে। এই বৈষম্যের ফলে নারী যদি সমাজবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুরুষের পদানুবর্ত্তিনী হয়, তবে ত না হয় একরকম সাম্য পাওয়া গেল; যেখানে তা' পাওয়া যায় না সেখানেই নারী নিপীড়িতা হইয়া থাকে, অর্থাৎ নারীর বেলাই বিধিব্যবস্থার বোঝা স্কন্ধেই থাকিয়া যায়।

ইংরাজি দণ্ডবিধি আইনে এই আত্ম-ব্যভিচার দোষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, আমাদের আইনে ইহা দোষের। এইখানেই ইংরাজের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। আমরা চাই অন্তঃশুদ্ধি, ইংরাজেরা চায় বহিঃশুদ্ধি। তাই ইংরাজি ভাষায় অভক্ষ্য ভক্ষণ পাপ নহে, অগম্যা-গমনও তেমন পাপ নহে। তাই তাহার দণ্ডও সৃষ্টি হয় নাই। সুরাপান করিলে আমাদের আইনে দ্বিজাতির প্রাণদণ্ডের বিধান—ইংরাজি আইনে থানায় পড়িলে পাঁচ টাকা জরিমানা। তফাৎ এইখানে।

রক্তমাংসের শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমাজের বিধি

ব্যবস্থা সৃষ্ট হয় নাই। শাস্ত্রও কখন মানবকে অতিপ্রাকৃতের ভজনা করিতে উপদেশ দেয় নাই। এইজন্য পাপ-তাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অধিকার অনধিকার বিবেচনা করিয়া আমাদের শাস্ত্র স্ত্রী-পুরুষের সহজ জীবনকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শাস্ত্রের শাসন কেবল মানবকে বড় করিবার জন্য। যে বড়—প্রকৃতই বড়—শাস্ত্র তাহাকে কোনদিনই আঁটিতে পারে নাই। এইজন্য প্রকৃত বড়'র দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ মানবের জীবনকে তুলিত করা কদাপি উচিত নহে।

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা"

এই কথাটাই, শাস্ত্রের বড়কে না আঁটিয়া পারিবার কথা।

ধনাধিকার লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আপাততঃ একটু বৈষম্য দেখা যায়। পুত্র ও কন্যার এককালে পিতৃধনে সমান অধিকার থাকে না। পুত্রেরই অগ্রে অধিকার, পুত্র না থাকিলে কন্যার। আবার মাতার যৌতকধনে অগ্রে কন্যার অধিকার, পরে পুত্রের। এ ছাড়া মাতার অযৌতক ধনেও কন্যাপুত্রের সমান অধিকার।

এদিকে স্বামীর ধনে স্ত্রীর প্রথমাধিকার না থাকিলেও, পুত্রেরাও মাতার বিনানুমতিতে পৈতৃক ধন বিভাগ করিবার ধর্ম্মতঃ অধিকারী নহে। অন্যদিকে স্ত্রী, পুত্রাদির অভাবে স্বামীর ধনে অধিকারিণী হইলেও স্বচ্ছন্দে দান বিক্রয় করিবার অধিকারিণী নহে। আবার অন্যত্র—

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিৎ নিরিন্দ্রিয়াঃ॥"

(মনু)

"পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।
অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

এই সমস্ত বচনে পতিত ব্যক্তির ধনাধিকার নাই যেমন বলা হইয়াছে—আবার—

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ॥
অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ॥
নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ 'ক্লীব প্রভৃতির ক্ষেত্রজ ও ঔরসপুত্র ক্লীবত্বাদি দোষরহিত হইলে ভাগহারী হয়, আর ইহাদিগের কন্যা যাবৎ বিবাহিতা না হয়, তাবৎ ভরণীয়া হয়। আর ইহাদের পুত্রহীনা ভার্য্যা যদি সচ্চরিত্রা হয়, তবে তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী। ব্যভিচারিণীকে দূর করিয়া দিবে, গ্রাসাচ্ছাদন কিছুমাত্র দিবে না।' এই সমস্ত বচনে ব্যভিচারিণী নারীরও ধনাধিকার দেখা যায় না। পাতিত্য হিসাবে স্ত্রীপুরুষের ধনাধিকার হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও নাই। অবশ্য আজকালকার হিন্দুদিগের প্রতি প্রযোজ্য দেওয়ানী আইনের মধ্যে পাতিত্য হিসাবে ধনাধিকার-রাহিত্য কথাটা বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক নারীর ধনাধিকার সম্বন্ধে এই যে বৈচিত্র্য, ইহাতেও নারীকে নিপীড়িত করা হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রের "পিণ্ডং দত্বা হরেদ্ধনং" কথাটার উপর নির্ভর করিয়া ইহার বিচার করিলে, নারীর প্রতি এই ধনাধিকারের একটু বাঁধাবাঁধি নিয়মের রহস্যটা পরিষ্কার হইয়া যায়। পুরুষেরই পিণ্ডদানের প্রথম অধিকার, এইজন্য ধনাধিকারটাও তাহার প্রথমে। পুরুষের পিণ্ডদানের কেন প্রথমে অধিকার থাকিল, ইহার আলোচনা করিতে বসিলে অনেক সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়। সে সব কথা ছাড়িয়া দিয়া, মোটামুটি পুরুষের নামেই যে বংশের পরিচয় থাকে, পুরুষের ধারাই যে বংশের ধারা, তাহা মানিয়া লইয়া ইহার বিচার

করিতে হইবে। এই সমস্ত বিচার করিলে পুরুষের এই প্রথমা-ধিকার লইয়া নারীর অধিকারের সাম্য আছে বলিতে হইবে। তথাপি কোন কোন স্থলে নারীর প্রথমে ধনাধিকার আছে, কোন স্থানেও বা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারও আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল।

ধর্ম্মজীবনের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষের অনেক বৈষম্য আছে। দ্বিজাতির ভিতরে পুরুষের দশসংস্কার আছে। নারীর মাত্র বিবাহই প্রধান সংস্কার। উপনয়নাদি নারীর নাই। অনেক ব্রত উপবাসেও নারীর কাম্যধর্ম্ম আছে বটে, তাহাও আবার স্বামীর আদেশ না থাকিলে না করিলে ক্ষতি নাই। দ্বিজাতির এক সূর্য্যে দুইবার অন্নভোজন নাই। নারীর তাহাতে বাধা নাই। দ্বিজাতির শূদ্রপক্ব অনোদন পদার্থ ভোজনে বাধা আছে, নারীর সেরূপ বাধা নাই। স্পর্শদোষ দ্বিজাতি-রাই মানেন, নারীরা ততটা মানেন না। এই সমস্ত বিষয়ে পুরুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে, নারীকে ততটা বাঁধা নাই।

আবার অন্যদিকে পুরুষের পক্ষে বাল্যবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, নারীর পক্ষে তাহাই আবার ধর্ম্ম। পুরুষ ভার্য্যাপুত্রবিহীন হইলে, আটচল্লিশ বৎসরের ভিতরে দারান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য, নারী কিন্তু স্বামি-পুত্রবিহীন হইলেও পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্য পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মোহে পুত্রাদি থাকিতেও আবার বিবাহ করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে শাস্ত্র বাধা দিতে পারেন না বটে, কিন্তু এরূপ বিবাহ যে কামনামূলক অধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিবাহগত অধিকার-পদ্ধতির পার্থক্য লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনে-কেই একটা ভয়ানক বৈষম্য লক্ষ্য করেন। এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতি-বাদও হইয়াছে বিস্তর। বিবাহটা যেকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বার ছিল না, বিবাহটা যেকালে মানবজীবনের একটা প্রধান সংস্কার বলিয়াই বিবেচিত হইত, তখনকার কালে অবশ্য ইহাতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না। আজকালকার কথা স্বতন্ত্র,

আজকাল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই প্রধান। তাই ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধক বস্তুমাত্রেই যেখানে স্বেচ্ছাচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, সেখানেই সেই ব্যাঘাতক আইনের প্রতি একটা তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। কাজেই নারীর ডাইভোর্স প্রথায় দ্বিতীয় বিবাহ না হউক, অন্ততঃ বিধবার বিবাহটায় অনেকেরই সহানুভূতি দেখা যায়। আজকাল যে দেশকালপাত্রের ধূয়া উঠিয়াছে, সেই ধূয়ার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর বিশিষ্টতা নষ্ট করা উচিত, না দেশকালপাত্রটার কবল হইতে হিন্দুর দৌর্ব্বল্যটাকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সবল করা উচিত, এ সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা আছে। আমরা তথাকথিত গোঁড়া হিন্দু, আমরা শাস্ত্রের শাসনকে পদদলিত করিতে ভয় পাই। আমরা বিশ্বাস করি—শাস্ত্রের শাসন মানিয়াও সকল উন্নতিকর কার্য্যই করা যায়। অবশ্য উন্নতিকর কার্য্যেও অনেক গোলযোগ আছে। সে যাহা হউক বিধবার উপর নির্দ্দয় ব্যবহারের বৃথা একটা কাল্পনিক চিত্র খাড়া করিয়া তাহাতে রং ফলাইয়া যাঁহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। হিন্দুর পল্লীসমাজে এখনও বিধবার আসন অনেক উচ্চে। এখনও বিধবা সেখানে দেবীর ন্যায় পূজিতা হইয়া থাকেন, এখনও বিধবার রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে অনবরত একটা পাপ উত্তেজনা প্রবেশ করাইবার মত পল্লীসমাজের অবস্থা হয় নাই। যখন তাহা হইবে তখন হিন্দুত্বও বিনষ্ট হইবে। তখনকার জন্য এখন চিন্তার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীনকালের সহমরণ প্রথার ভিতরে নারীজাতির প্রতি একটা ভয়ানক নৃশংস পীড়নের ভাব যাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাহাদেরও এই ভাবেরও কোন মূল্য নাই। সহমরণ কথাটাও অবশ্য অনেক উচ্চ-ধর্ম্মের কথা। যখন "যদেব হৃদয়ং মম, তদেব হৃদয়ং তব" বলিয়া হৃদয়ে হৃদয় এক হইয়া যায়, যখন নারীর সহিত পতির একটা পার্থক্যজ্ঞান থাকে না, তখনকার এই অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর মৃত্যু অস্বাভাবিক নহে। এই সহমরণও আবার নারীর স্বেচ্ছায় হওয়া চাই।

"যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ"।

নারীর যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইবার অধিকার কাহারও নাই।

"মৃতে ভর্ত্তরিব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বা।"

(বিষ্ণু)

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণই নারীর ধর্ম্ম। এখানে নারীর অধিকার লইয়াই কথা। যাহার সহমরণে অধিকার আছে, সে-ই সহমরণে যাইবে। আবার এই সহমরণের ভিতরে বাঁধাবাঁধি নিয়মও আছে। যে নারীর পুত্র অল্পবয়স্ক, যে নারী রজস্বলা, যে নারী গর্ভবতী, সূতিকা ও অরজস্কা তাহাদেরও সহমরণে যাইবার অধিকার নাই।

এছাড়া বিদেশে যদি পতির মৃত্যু হয়, স্ত্রী যদি সেখানে না থাকেন, তবে সেই নারীও স্বামীর অনুগমন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণী নারী সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য অন্য নারীদের অনুমরণের ব্যবস্থা আছে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নারীকে কখন জোর করিয়া অগ্নিতে দাহ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দেন নাই। আজকাল অনেকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিবার কথা বলেন বটে, কিন্তু আমরা উহা মোটেই বিশ্বাস করি না। হয় তাহার মধ্যে অন্য গূঢ় কারণ আছে, না হয় উহা মিথ্যা। অধুনাও অনেক সাধ্বী নারীর বিষয় মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, তাহারা ভর্ত্তার মৃত্যুর পর শরীরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করেন। এইরূপ আত্মহত্যার কথা সংবাদপত্রাদিতে বৎসরে দুই চারিটাও শুনা যায়। যদি এই-রূপ সাধ্বীর এইরূপ মৃত্যু সত্য হয়—পতিশোকই যদি তাহার কারণ হয়—তবে তাহাদের যে সহমরণে অধিকার ছিল তাহা স্বীকার করি-

তেই হইবে। অথচ ইহাদের প্রকৃত সহমরণ হয় না, আত্মহত্যা হয়। ইহার জন্য এক্ষণে দায়ী কে?—শাস্ত্র তাহাদের বৈধ মৃত্যুতে অধিকার দিয়াছিল,—অথচ আইন করিয়া সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। তাই সমাজে পাপও বাড়িতেছে।

এখানে কথা উঠিতে পারে—পত্নীর বেলায় সহমরণের ব্যবস্থা, স্বামীর বেলায় তাহা নাই কেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে—অধিকার মুখের কথায় হয় না। জোর-জবরদস্তি করিয়াও কেহ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। উহা অন্তরের বস্তু। যদি পুরুষের সেইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে শাস্ত্রেও তাহার সহমরণের ব্যবস্থা থাকিত। এই অধিকার-পদ্ধতি লইয়া আরও অনেক আলোচনার বিষয় ছিল—কিন্তু এবার এই পর্য্যন্ত।

শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১০]

(অগ্রহায়ণের নারায়ণের ১২২ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৫)

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

আমার মনে হয়, ভগবদ্‌গীতায় যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, সকলের আগে গীতার সপ্তম অধ্যায়টি ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। কারণ এইখানেই আমরা গীতার ভগবত্তত্ত্বের মূলসূত্রটি প্রত্যক্ষ করি।

গীতা এই অধ্যায়ে প্রথমেই যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা সামান্য জ্ঞান নহে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি—যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হয় ইত্যাদি কথায়, সামান্য ভাবে পরমতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। তার পরেই—"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব"—তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা কর—বলিয়া এই তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সামান্য জিজ্ঞাসা যাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহাই জ্ঞান। এই বিজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা যাহার দ্বারা নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়, তাহাই বিজ্ঞান। কেবল শুনিয়া কিম্বা অনুমান করিয়াও এই সামান্য জ্ঞান একরূপ লাভ করা যায়। পৃথিবী কমলা-লেবুর মতন গোলাকার—ভূগোলসূত্রের এই কথা শুনিয়া পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা শ্রুত-জ্ঞান মাত্র, তাহা অনুমান-প্রতিষ্ঠ, এই অনুমান আবার উপমানের সহায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জ্ঞানকে বিশেষ জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহাতে আমাদের কোনও

প্রত্যক্ষের বা অনুভূতির প্রামাণ্য বিদ্যমান নাই। এইরূপ "যতো বা ইমানি ভূতানি" প্রভৃতি শ্রুতি-সহায়ে আমরা ব্রহ্মের বা পরম-তত্ত্বের যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাও প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি-প্রতিষ্ঠ নহে; অনুমান-প্রতিষ্ঠ মাত্র। ভূতগ্রাম ছিল না, হইল—দেখি। যাহা ছিল না, তাহা যখন হইতে দেখি, তখনই এই অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহা কোনও না কোনও আকারে, কোথাও না কোথাও, অবশ্যই ছিল। সেইখান হইতেই এইখানে আসিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে বা যাহাতে পূর্ব্বে এই ভূতগ্রাম ছিল, তাহাকেই এই শ্রুতি ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সামান্যজ্ঞান, বিশেষজ্ঞান নহে। ইহা হইতে ব্রহ্মের সত্তাই কেবল জানি, কিন্তু স্বরূপের কোনও সন্ধান পাই না। ভৃগু তপস্যা করিয়া ক্রমে এই স্বরূপের জ্ঞানলাভ করেন। তপস্যা অর্থ মনন—শ্রুতিবাক্যের অর্থ গ্রহণের জন্য গভীর চিন্তা। এই তপস্যার বা মননের বা চিন্তার আশ্রয় সাধকের নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়াই ভৃগু প্রথমে "অন্নকে," পরে "প্রাণকে," তার পরে "মনকে", তার পরে "বিজ্ঞানকে" ও সর্ব্বশেষে "আনন্দকে" ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। এইরূপেই সাধক আপনার আন্তরিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া পরমতত্ত্বের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করেন। এই অনুভূতি-সমন্বিত যে জ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞান কহে।

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ"—

গীতা সপ্তম অধ্যায়ে এই অনুভূতি-সমন্বিত জ্ঞানের ব্যাখ্যাই করিতেছেন।

আমাদের অনুভূতিতে আমরা এই সংসারে দুইটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি,—এক বিষয়, অপর বিষয়ী। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য, কর্ত্তা ও কর্ম্ম, এই লইয়াই আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। জ্ঞেয়, ভোগ্য, কর্ম্ম—এই তিনটি বিষয়।

জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা,—এই তিনটি বিষয়ী। কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়? সমুদায় জ্ঞেয় ও ভোগ্য বিষয়ের ও যাবতীয় কর্ম্মের আশ্রয়ের বিশ্লেষণ করিয়াই গীতা ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জীবের অহংবোধ বা অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিষয়-রাজ্য ইন্দ্রিয়পথে আমাদের অনুভবগম্য হয়। শব্দস্পর্শরূপরসাদির সাহায্যেই আমরা এই নিখিল জগতকে জানিতেছি। শব্দের আশ্রয় আকাশ; স্পর্শের আশ্রয় বায়ু; রসের আশ্রয় জল; গন্ধের আশ্রয় ভূমি বা পৃথিবী; আর রূপের আশ্রয় অনল বা তেজ। এই ভাবেই আমাদের দেশের প্রাচীন মনস্তত্ত্বে এই বিষয়-জগতকে পঞ্চ মহাভূতেতে বিভক্ত করিয়াছিল। ইউরোপীয় রসায়নশাস্ত্রে যাহাকে element বলে, আমাদের এই পঞ্চ মহাভূত তাহা নহে। এই element কথাটি জড়বিজ্ঞানের কথা; আমাদের পঞ্চ মহাভূত মনোবিজ্ঞানের কথা। রাসায়নিক element, রূঢ় পদার্থ, compound বা যৌগিক পদার্থ নহে। মনস্তত্ত্বের মহাভূত যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটিমাত্র আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, চক্ষু, কর্ণ, রসনা, নাসিকা ও ত্বক। এই বিষয়জ্ঞানের আর যষ্ঠ পথ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, কখন হইবেও না। কেহ কেহ মনকে এই যষ্ঠ পথ বলিতে পারেন, কিন্তু মন এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই রাজা, ইহাদের সাহায্যেই আপনার মননক্রিয়া সম্পাদন করে। আর রূপরসাদি পাঁচটি দ্রব্যগুণের আশ্রয়েই এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যাবতীয় বস্তুজ্ঞান লাভ করে। রূপ আলোর অপেক্ষা রাখে, আলো আর তেজ একই কথা বা বস্তু। এই জন্য তেজকে রূপতন্মাত্রা বলে। এইরূপে জলকে রসতন্মাত্রা, বায়ুকে স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশকে শব্দতন্মাত্রা এবং পৃথিবীকে গন্ধতন্মাত্রা বলে। এই রূপরসাদি যেমন আমাদের জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, সেইরূপ ইহারাই আবার আমাদের ভোগ্য বা

ভোগের বিষয়; এবং এই সকলকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করা, এই সকলকে উৎপাদন বা ইহাদের নিরসন করাই আমাদের যাবতীয় শারীর কর্ম্মের লক্ষ্য। সুতরাং এই রূপরসাদিই আমাদের কর্ম্মেরও আশ্রয়। তারপর এসকল ছাড়া মনোবস্তুও আমাদের জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের বিষয় হয়। অপরের মন আমরা সর্ব্বদাই মনোভাবের দ্বারা জানিতেছি, জানিয়া তাহা হইতে আনন্দ বা নিরানন্দ লাভ করিতেছি; আর আমাদের নিজেদের কর্ম্মের দ্বারা অপরের মনের মধ্যে বিবিধ মননক্রিয়াও উৎপন্ন করিতেছি। সুতরাং এই মনও আমাদের অনুভূতির বিষয় হইয়া আছে। সেইরূপ আমাদের নিজেদের মনও আমাদের জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের বিষয় হইতেছে। যেমন মন সেইরূপ বুদ্ধিও আমাদের জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতেছে, অপরের বুদ্ধিও হইতেছে, নিজের বুদ্ধিও হইতেছে। সর্ব্বোপরি এই যে আমিত্ববোধ, আমি আর সকল হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, এই যে ধারণা, ইহাকেই অহঙ্কার বলে। এই অহঙ্কারও আমাদের জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের বিষয় হইয়া আছে। অপরের আমিত্বকে আমরা সততই স্বল্পাধিক জানিতেছি, অপরের আমিত্ব হইতে সর্ব্বদাই আমাদের সুখদুঃখাদি জন্মিতেছে এবং বহুবিধ উপায়ে আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের এই অহঙ্কারকে বা এই আমিত্বকে বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। এই আমিত্ব বা অহঙ্কারও আমাদের জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের বিষয় হয়। আর এই কি আমাদের বিষয়রাজ্যের শেষ সীমা নহে? আমরা যাহা কিছু আমাদের অনুভবগম্য করিয়া থাকি, বা করিতে পারি, তৎসমুদায়ই কি এই সকলের কোনও না কোনও এক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না? পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়—আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই আট শ্রেণীর কোনও না কোনও শ্রেণীর মধ্যে কি আমাদের যাবতীয় জ্ঞেয় ও ভোগ্যাদি পড়ে না? ইহার বাহিরে এমন আর কি আছে যাহাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির (আর এখানে ইন্দ্রিয় বলিতে

মন পর্য্যন্ত বুঝিতেছি) দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি? এইগুলিই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের, ভোগের ও কর্ম্মের আশ্রয়। এইগুলিই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য।

এখন প্রশ্ন উঠে, এই বিষয়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়? রূপতন্মাত্রা ও তেজ, রসতন্মাত্রা ও জল, স্পর্শতন্মাত্রা ও বায়ু, গন্ধতন্মাত্রা ও পৃথিবী এবং শব্দতন্মাত্রা ও আকাশ;—ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই প্রত্যক্ষ তেজাদি, এই সকল তন্মাত্রার আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছি, আবার এসকল তন্মাত্রার জ্ঞান, আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সাপেক্ষ। চক্ষু না থাকিলে, রূপের প্রামাণ্য থাকে না; কাণ না থাকিলে শব্দের, ত্বক না থাকিলে স্পর্শের, নাসিকা না থাকিলে গন্ধের, আর রসনা না থাকিলে রসের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইটি দেখিয়া হঠাৎ মনে হয় যে এই বিশাল জগৎটা বুঝি আমার এই কয়টা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির আশ্রয়েই বাস করিতেছে। যার চক্ষু নাই তার কাছে রূপও নাই; যার কাণ নাই তার কাছে শব্দও নাই। জড়বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে এমন একদিন ছিল যখন এই পৃথিবীতে চক্ষুকর্ণনাসিকাদি-সমন্বিত কোনও প্রাণীর উদ্ভব হয় নাই। এই ধরণী তখন এক জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডের মতন শূন্যে ঘুরিতেছিল। সে অগ্নিপিণ্ডের গায়ে কোনও প্রাণীর বাস করা সম্ভব ছিল না। তবে তখন ত এজগতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন কোনও প্রাণী ছিল না, তাহা হইলে তখন রূপরসাদির জ্ঞানও কাহারও ছিল না। যার জ্ঞান নাই, তার সত্তাও অসিদ্ধ। তখন যে পঞ্চ মহাভূতাদি ছিল, ইহারই প্রমাণ কি? আর আদিতে যদি এগুলি ছিল না, ইহাই স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে পরে, কোথা হইতে, কিরূপে এগুলির উৎপত্তি হইল? এই প্রশ্ন উঠে। তবে কি বলিব যে, যেদিন জীবের চক্ষু ফুটিল সেই দিনই রূপের ও তেজেরও সৃষ্টি হইল? অর্থাৎ চক্ষুই রূপ সৃজন করিল; সেইরূপ কর্ণ শব্দ সৃজন

করিল, নাসিকা গন্ধ সৃজন করিল; এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল আপনারা ফুটিয়া নিজ নিজ বিষয়ের সৃষ্টি করিয়া লইল? কিন্তু যে যে বস্তুর সৃষ্টি করে, সে তার নিয়ন্তা ও প্রভু হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু আপন স্রষ্টার অধীন হয়। প্রত্যেক স্রষ্টা আপনার সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। চক্ষুরাদিই যদি রূপরসাদির স্রষ্টা হয়; তাহা হইলে, ইহারা রূপরসাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু তাহা ত দেখি না। চক্ষু না থাকিলে যেমন রূপ থাকে না, ঠিক সেইরূপ রূপ না থাকিলেও চক্ষু যে আছে তার প্রমাণ পাই না। রূপ যেমন চক্ষুর অধীন, চক্ষু সেইরূপ রূপের অধীন। শব্দ যেমন শ্রুতির অধীন, শ্রুতিও সেইরূপ শব্দের অধীন। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বিষয়ের বা তন্মাত্রার অধীন। ইহারা একে অন্যকে ছাড়িয়া নিজেকে রক্ষা করিতে ত পারে না। ইহারা অনন্যাপেক্ষী। অনন্যাপেক্ষী বস্তুমাত্রেই স্বতন্ত্র হইতে পারে না। সুতরাং চক্ষু এবং রূপ, শ্রুতি এবং শব্দ, রসনা এবং রস, এসকলের উভয়ের কোনও একটা সামান্য আশ্রয় অবশ্যই আছে। সেই আশ্রয়াধীনে চক্ষু যখন ফোটে নাই, তখনও দৃষ্টিশক্তি ছিল, রূপ যখন ফোটে নাই, তখনও তার বীজ ছিল। সেই আশ্রয়াধীনে যাবতীয় জ্ঞানের শক্তি ও যাবতীয় জ্ঞানের বীজ অনাদিকাল হইতে ছিল, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। আমাদের অনুভূতিই এই আশ্রয়েরও প্রতিষ্ঠা করে।

জ্ঞেয়, ভোগ্য ও কর্ম্মের নিঃশেষ বিশ্লেষণ করিয়া, অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জ্ঞেয়, ভোগ্য ও কর্ম্মকে আমাদের ঐকান্তিক মননের বিষয় করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এসকলের একটা অনাদ্যনন্ত আশ্রয় অবশ্যই আছে। কিন্তু কেবল জ্ঞেয়, ভোগ্য, বা কর্ম্মই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় নহে। জ্ঞাতা, ভোক্তা এবং কর্ত্তাও আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু। আমরা নিজেরাই যে জ্ঞাতা ও ভোক্তা ও কর্ত্তা। আর ইহাও আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি যে

আমাদের এই জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ নহে; ইহা ক্রমশঃ ফোটে, ক্রমশঃ বাড়ে, আমাদের জ্ঞানের, ভোগের কর্ম্মের উপচয় অপচয় হয়, এগুলি পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিত্যসিদ্ধ নয়, যাহা বিকশিত হয়, যাহা বাড়ে ও কমে, তাহা কদাপি স্বপ্রতিষ্ঠও হইতে পারে না। এ বস্তু আপনি আপনার প্রতিষ্ঠা, আপনি আপনার আশ্রয় হইতেই পারে না। সুতরাং আমাদের জ্ঞেয়, ভোগ্য ও কর্ম্ম জগতের যেমন একটা নিত্য আশ্রয় প্রয়োজন, সেইরূপ আমাদের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বেরও একটা নিত্য আশ্রয় আবশ্যক। এই নিত্য আশ্রয় কে, বা কোথায়?

জ্ঞেয়, ভোগ্য, কর্ম্মের সাধারণ নাম প্রকৃতি। জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তার সাধারণ নাম পুরুষ। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিশ্লেষণেই আমরা এই দুই তত্ত্বে উপনীত হই। প্রকৃতি পুরুষের অধীন; কারণ জ্ঞেয় মাত্রেই জ্ঞাতার অধীন, ভোগ্য মাত্রেই ভোক্তার অধীন, কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তার অধীন। অন্য পক্ষে পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা রাখেন, প্রকৃতির আশ্রয় বা সান্নিধ্য ব্যতীত তাঁর পুরুষত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না ও হইতেই পারে না। জ্ঞেয়ের সাক্ষাৎকার না হইলে, জ্ঞাতার প্রতিষ্ঠা হয় না। ভোগ্য-সাক্ষাৎকার ব্যতীত ভোক্তার প্রতিষ্ঠা ও কর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত কর্ত্তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ও অসাধ্য। আমরা যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য, কর্ম্ম ও কর্ত্তাকে প্রত্যক্ষ করি, ইহারা কেহই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠা কোথায়?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমিই এই প্রতিষ্ঠা। আমিই পুরুষ। আর—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্ঠধা॥ (৭-৪)

পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই সকল আমারই বিভিন্ন অষ্ট প্রকৃতি।

এইখানেই গীতায় সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

তোমার দান

[১]

এত যে জ্বালা এত যে দুখ, তোমার দান—তোমার দান!
ব্যথার ঘাতে ভগন বুক, তোমার দান—তোমার দান!
দু'চোখ্-বহা তপ্ত ধারা,
ঝরিছে যত নির্ঝর পারা,
সে তব কম-করুণা জারা দু'কূল-ধোয়া উছল বান;
ব্যাকুল প্রাণে অকূলে ভাসা, তোমার দান—তোমার দান!

তোমার দান—হীনের মত নীরবে সহা এ অপমান;
তোমার দান—ঢাকিয়া ক্ষত আপোষে করা হাসির ভান।
তোমার দানে জঠরানলে
আহুতি বিনা এদেহ জ্বলে,
পিষিয়া হিয়া পাশব বলে দু'পায়ে দলে সরল প্রাণ;
অসহনীয় ব্যথার বোঝা তোমার দান—তোমার দান!

[২]

সহিতে যদি ক্ষমতা থাকে সে ব্যথা নহে তোমার দান;
বহিতে যদি শকতি থাকে সে বোঝা নহে তোমার দান!
বিপদে যদি না থাকে ভয়,
দুঃখে যদি লভিব জয়,
সে দুখ-তাপ তোমার নয়, কেবল মিছা চাতুরী-ভান,—
আপন হাতে রচনা করা আপন-ধরা মোহের ফান।

যখন তুমি বেদনা দিয়ে শোধন কর দূষিত প্রাণ,
আকুল রবে কাঁদন ছাড়া কিছুতে আর নাহিক ত্রাণ।
বেদনা যদি ব্যথা না দিবে,
কেমনে তব সাধনা হবে,
তোমার বাজ পরাণে স'বে কে আছে হেন শকতিমান্?
যে ব্যথা আমি সহিতে পারি, সে ব্যথা নহে তোমার দান।

দরবেশ।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২২ সাল

বৈষ্ণব-কবিতার কথা

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব। সাধারণ লোকে, এমন কি বৈষ্ণব সাধকেরা পর্য্যন্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জানি। কিন্তু এই দেবতাও যে মানুষ, একথা পাঠকেরা বিস্মৃত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব কবিগণ কখনও ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যিনি যখনই যেখানে এটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তখনই সেই-খানে তাঁহার কবিতায় গুরুতর রসভঙ্গ হইয়াছে।

এইজন্য মহাজন-পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে, শ্রীকৃষ্ণ যে দেবতা, এই কথাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবনলীলা যে নর-লীলা, বৃন্দাবনের সকলই যে মানুষ—তোমার আমার মতন মানুষ, তোমার আমার মতন সুখদুঃখের অধীন, তোমার আমারই মতন মায়ামমতায় আবদ্ধ—ইহা যারা বুঝে না, বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই নরলীলাকে যারা একটা অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাদের পক্ষে মহাজন-পদাবলীর নিগূঢ় রস নিঃশেষে আস্বাদন করা আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মাধুর্য্যের সাধক। আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

বারম্বার বলিয়াছেন যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উন্মেষমাত্র মাধুর্য্য রস একেবারে উভিয়া যায়। ঈশ্বর-ভাবই ঐশ্বর্য্য। শ্রীকৃষ্ণকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য কদাপি আস্বাদন করিতে পারিবে না। সে একটা ব্রজ কল্পনা করিয়া লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রস্নেহ কল্পনা করে, সেইরূপ সে একটা নিতান্ত মনগড়া সম্বন্ধের আশ্রয়ে এই লীলারস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ কল্পনাবলেও তার পুলকাশ্রু প্রভৃতির সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এসকল বিকার শারীরিক, সাত্ত্বিক নহে। খোলে চাঁটি পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়া উঠে, এ এক নাচা; আর অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহাকে ছড়াইয়া দিয়া, তাহাদের চঞ্চল করিয়া নৃত্যশীল হওয়া অন্য কথা। একটা সাধারণ স্নায়বীয় উত্তেজনা মাত্র, আর একটা ভাবের তরঙ্গভঙ্গ। সেইরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল ঝঙ্কারে, কেবল সুরে, অথবা কেবল একটা অলীক মানস-কল্পনাবলেও পুলকাশ্রু প্রভৃতির উদ্রেক হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সত্য রসানুভূতির কোনও সম্বন্ধ নাই। সাধারণ লোকে, এমন কি অনেক গতানুগতিক তিলককণ্ঠিধারী বৈষ্ণবে পর্য্যন্ত, এই ভাবেই মহাজন-পদাবলীর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর এই সকল অলীক ভাবপ্রবণ লোকের হাতে পড়িয়াই, মাঝখানে এই সকল অমূল্য পদাবলী আপনার যথার্থপ্রাপ্য মর্য্যাদা হারাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তাগণ ইঁহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহাই আমাদের বাঙ্গালার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব। অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব-তত্ত্বের কথা বেশী কিছুই জানি না; কিন্তু মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিতেই যেন

কুণ্ঠিত হয়, এমন মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, কিন্তু অবতারী। যিনি অবতার করান, তিনিই অবতারী। সৃষ্টি ও স্রষ্টাতে যে পার্থক্য, অবতার ও অবতারীতে সেই পার্থক্য। আর অবতারী বলিয়াই বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা বলেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" আর তাঁরা ইহাও বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে নররূপের বর্ণনা ভাগবতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মায়িকও নয়, আকস্মিকও নয়, কিন্তু তাঁর নিত্য-স্বরূপ। এই নিত্য-স্বরূপে ভগবান্ দ্বিভুজ, "ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।" তাঁর চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি রূপই বস্তুতঃ মায়িক, ভক্তের তৃপ্তির জন্য তিনি এসকল অমানুষী ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করেন। দ্বিভুজ মুরলাধর রূপই তাঁর স্বরূপ। এই রূপই তাঁর নিত্যরূপ।

আর নররূপই যদি তাঁর নিত্যরূপ হয়, তবে মানব-ধর্ম্মও তাঁর নিত্যধর্ম্ম হইবেই হইবে। রূপে আর গুণে তাঁর মধ্যে ত কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না; তাহা হইলে তাঁর ভগবত্ত্ব ও পূর্ণত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ রূপ, নরধর্ম্ম এবং মানবপ্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়াই তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ; এই মানুষ রূপ ও মানুষী প্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে; তাঁর মধ্যে এ সকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়াই আছে। আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি পরিণামী, তাঁর নররূপ ও নরপ্রকৃতি নিত্যসিদ্ধ। আর আমাদের এই অপূর্ণতাই তাঁর ঐ পূর্ণতার প্রমাণ প্রদান করে। আমরা যে এখানে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহা হইতেই কোথাও যে আমাদের এই মানবতা নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে, ইহা বুঝিতে পারি। আমাদের রূপ-লালসা ঐ রূপকেই যে নিয়ত খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের অন্তরে গুণের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাও ঐ অনন্তগুণাধারকে অন্বেষণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয়, এই মন, এই বুদ্ধি, এই আত্মা, এই সর্ব্বস্ব

আমাদের, সেই নরোত্তম ও পুরুষোত্তমেরই জন্য নিরত পিপাসিত হইয়া, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা করে। আর বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর সত্য রস আস্বাদন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে এই নরোত্তম ও পুরুষোত্তম রূপেই দেখিতে হইবে।

নর আর নরোত্তম, পুরুষ আর পুরুষোত্তম, সজাতীয়, সমান ধর্ম্মী বস্তু। এই নরের মধ্যেই ঐ নরোত্তম, এই পুরুষের ভিতরেই ঐ পুরুষোত্তম রহিয়াছেন। আবার ঐ নরোত্তমের মধ্যেই এই নর, ঐ পুরুষোত্তমের ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে। এইজন্য নর, নরোত্তমকে চিনে, বুঝে, অত করিয়া ভালবাসে। যে যা নয়, সে তাহা জানে না, জানিতে পারে না; বুঝে না, বুঝিতে পারে না। আমরা মানুষ, যে ঈশ্বরে কোনও মানুষীভাব ও মানুষীধর্ম্ম নাই, আমরা তাঁকে কথনওই কোনওমতে জানিতে ও ভজিতে পারি না। ভাবের ঐক্য ব্যতীত ভজনা হয় না। ঈশ্বরের ভজনা করিতে হইলে হয় ঈশ্বরকে মানুষ হইয়া নামিয়া আসিতে হয়, না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া যাইতে হয়। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া তবে তাঁর ভজনা সম্ভব করিয়াছে। আমাদের দেশের বৈদান্তিক সাধনা অন্যদিকে মানুষকে ব্রহ্ম করিয়া উপরে তুলিয়া ব্রহ্মেতে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ করিলে তাঁর ঈশ্বরত্বও নষ্ট হয়, মানবত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশ্বরের এই মানবত্ব সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মানুষ যদি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহা মানুষ নয়, আর মানুষ বলিতে যাহা ঈশ্বর নয়, যদি ইহাই বুঝি, তাহা হইলে ঈশ্বর কথনও সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না। আমাদের বৈদান্তিকেরা এইজন্য ঈশ্বরের মানবত্ব-স্বীকারকে মায়িক বলিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ইতিহাসেও এরূপ মায়াবাদী সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একদল প্রাচীন খৃষ্টীয়ান বিশুখৃষ্টের নরলীলাকে real নয়, apparent মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

প্রচলিত অবতারবাদের এই স্ববিরোধিতা* খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন—ঈশ্বরই মানুষ, নিত্যসিদ্ধ মানুষ,

গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং

পরব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের (বা Ultimate Realityর) নিগূঢ় স্বরূপ মনুষ্যলিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই নররূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ রূপ। এইজন্যই তিনি নিজস্বরূপে নরোত্তম ও পুরুষোত্তম।

কিন্তু আমাদের বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে কেবল নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপেই আবার নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি—যাবতীয় রসের ও সমুদায় অমৃতের মূর্ত্তি। রসবস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়, আন্তরিক অনুভবের দ্বারাই কেবল ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বস্তুকে কেউ কোনও দিন চক্ষু দিয়া দেখে নাই, কাণ দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে নাই; রসনার দ্বারা কেউ কথনও এবস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করে নাই; নাসিকা দিয়া ইহার গন্ধও পায় নাই। এবস্তু অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, তথা অরস। অথচ রূপরসশব্দস্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভালবাসার রূপ নাই, অথচ রূপের আশ্রয়ে, রূপের প্রেরণা ব্যতিরেকে এবস্তু জন্মে না বা জাগে না, আর জন্মিয়া বা জাগিয়া রূপকে আশ্রয় না করিয়া ইহা আপনাকে প্রকাশও করিতে পারে না। যে ভালবাসে, তার মুখে, চক্ষে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, সমুদায় দেহের মধ্যে এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। মাতালকে যেমন দেখিলেই চিনা যায়, যে প্রেমমদে মাতোয়ারা তাহাকেও সেইরূপ দেখিলেই চিনা যায়। প্রেমক্রোধাদি মনের ভাব হইলেও, এসকল ভাব যখন মনে জাগে ও বাড়িয়া উঠে, তখন শরীরে পর্য্যন্ত একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকট হয়। এই রূপই এই সকল রসের মূর্ত্তি। এই সকল রসমূর্ত্তি একদিকে অন্তরের রসকে ঘন করিয়া আমা-

দের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয় করে; অন্যদিকে অপরের রসকে যখন এরূপভাবে বাহিরে ফুটাইয়া তুলে, তখন ইহাকে দেখিয়া আমাদের অন্তরের অচেতন রস সচেতন হয়, সুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠে। হাস্যের মূর্ত্তিতে আমরা হাস্যরস আস্বাদন ও সম্ভোগ করি; আবার এই মূর্ত্তি দেখিলে আমাদের হাসি পায়। প্রেমের মূর্ত্তিতেও এইরূপে প্রেম-সম্ভোগ হয় ও প্রেমের উদ্দীপনা হয়। অন্তরের রস যতক্ষণ না এইরূপে আপনার নিজস্ব মূর্ত্তির আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ তাহা আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয়ও হয় না, আর আমাদের সুপ্ত রসকে জাগাইয়া তুলিতেও পারে না। যাঁহার মধ্যে সকল রস মূর্ত্তিমান হইয়া আছে, অর্থাৎ আমাদের অন্তরের যাবতীয় রস যাঁহাকে অন্বেষণ করে, ও যাঁহাকে দেখিয়া বা যাঁহার আভাস পাইয়া সমুদায় সুষুপ্ত রস জাগিয়া, নাচিয়া, উপচিয়া পড়ে,—তাঁহাকেই নিখিলরসমূর্ত্তি বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণই এই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহাই বলে।

এই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির সঙ্গে একদিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও অপরদিকে আমাদের অতীন্দ্রিয়ানুভূতির অতি নিগূঢ়, অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল ঐ মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ লাভের জন্যই নিত্য পিপাসিত। আবার নিতান্ত ইন্দ্রিয়-রাজ্যে এবস্তুর সন্ধান পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। এবস্তু যেন অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে, আত্মার দহরাকাশ হইতে, বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের সমক্ষে চমকাইয়া উঠে। চোখ এই বস্তুর লোভেই রূপে রূপে পিয়াসু ভ্রমরের মতন চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যার মুখখানি মিষ্টি লাগে, একবার দেখিলে আরবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, চোখ ভাবে তারই মধ্যে বুঝি এই রূপ আছে। কিন্তু ইহার সাড়া পাইয়া হায়রাণ হয় মাত্র, ইহাকে ধরিতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়েরই এই দশা ও এই কথা। এরা সকলেই কি যেন চায় অথচ পায় না, কি যেন

ধরে ধরে কিন্তু ধরিতে পারে না। এই পাগল-করা, এই মনভুলান, এই প্রাণমাতান বস্তুকেই মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজনা করিয়াছেন। এইটি যে না জানে বা না বুঝে, এই কথাটি যে আপনার ভিতরকার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ধরিতে পারে না, তার পক্ষে আমাদের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পীযূষপদাবলী পড়া বা শোনা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।

যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, ও লীলার কথা মহাজন-পদাবলীতে পড়িয়া অমন আনন্দ পাই, সে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর না মানুষ, এ প্রশ্ন আমাকে করিও না। এসকল প্রশ্ন তুলিলেই আমার প্রাণের সকল রস উড়িয়া যায়, সকল আনন্দ নিভিয়া যায়। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে আমার বুক শুকাইয়া যায়। তবে আমার প্রাণের মর্ম্মের, আমার প্রকৃতির পরমাকাশের এ দুরন্ত জ্বলন্ত পিপাসা মিটাইবে কে? আমি যে চাই রূপ—ঈশ্বর অরূপ! আমি চাই রস, ঈশ্বর অরস। আমি চাই গন্ধ—ঈশ্বর অগন্ধ। আমি চাই আমার এই দুরন্ত ইন্দ্রিয়সকলকে শান্ত করিতে, এসকল আনন্দের দ্বারকে একেবারে বন্ধ করিতে চাই না, বন্ধ করিতে পারিও না, পারিলে আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। আর অশব্দ অরস অগন্ধ অস্পর্শ ঈশ্বরকে দিয়া আমার এই সকল শব্দস্পর্শরূপরসপিয়াসু ইন্দ্রিয়কুল তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অন্যদিকে কেবল মানুষকে দিয়াও আমার জীবন সার্থক হয় না। এই মানুষের মধ্যেই মানুষকে ছাড়াইয়া যেন একটা কি যেন কি আছে, তারই টানে আমাকে অমন পাগল করিয়া তুলে। এই জন্য বাল্যে সখাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ জুড়াইত-জুড়াইত কিন্তু জুড়াইত না, কে যেন আড়াল হইতে আমাদের দু'জনাকে আমাদের বাহিরে ও উপরে টানিয়া লইয়া যাইত। এইজন্যই ত যৌবনে সতীকে বুকে চাপিয়া চাপিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাও বাড়িয়া যাইত, যত নিকটে পাইতাম ততই যেন আরও দূরে পড়িতাম, যত প্রাণ ভরিয়া উঠিত,

ততই আরও ক্ষুধা বাড়িয়া যাইত, দেহ মন গলিয়া যতই পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া যাইত, ততই আরও গলিবার আরও মিলিবার সাধ প্রবল হইয়া উঠিত। মানুষকে ছাড়িয়াও আমাদের চলে না, মানুষকে লইয়াও চলে না। আমাদের প্রাণ চায় এমন কাহাকেও যাঁর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় মিশিয়া গিয়াছে; যাঁর মধ্যে বাস্তবই কল্পনা ও কল্পনাই বাস্তব হইয়াছে; যাঁকে দেখিয়া যাহা দেখা যায় না, তার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি; যাঁকে ছুঁইয়া যাঁকে ছুঁয়া যায় না, তাঁরই অঙ্গসঙ্গ পাইতে পারি; যার রসে মাখামাখি হইয়া, কোনও রস যাঁহার রসকে ব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁর অঙ্গে গলিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রাণ তোমার স্বর্গের ঈশ্বরকে চায় না। আমার প্রাণ তোমার মর্ত্ত্যের উপচয়-অপচয়শীল, রোগশোকজরামৃত্যুর অধীন মানুষকে লইয়াও চিরদিন ঘর করিতে পারে না। আমার প্রাণ চায় তাহাকে যে মানুষ বটে, কিন্তু যার রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, যে নিত্য-সবল, নিত্য-সুস্থ নিত্য-সুখী, নিত্য-রসময়, নিত্যানন্দময়, যে চিরকিশোর, চিরসুন্দর, যে আমার সকল আদর্শকে আয়ত্ত করিয়াছে, সকল চাওয়ার নিবৃত্তি করিতে পারে, যে আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা, আমার মানবতার সমগ্রতাকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতে পারে। মহাজনপদকর্ত্তাগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে আঁকিয়াছেন, তিনি এই বস্তু। জগতের আর কোনও কবি-সমাজ, আর কোনও কাব্য, কোনও সঙ্গীত, কোনও চিত্র বা কোনও ভাস্কর্য্যে অমন বস্তুটি আজ পর্য্যন্ত দিয়াছে বলিয়া জানি না। সকল দেশের সকল কবিই আংশিকভাবে এই চিরসুন্দরকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সত্য। বৈষ্ণব মহাজনেরাও আংশিকভাবেই ইঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, মানি। এ বস্তুর নিঃশেষ অভিব্যক্তি সম্ভবে না। কিন্তু বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণ এই অপূর্ণতার মধ্যেই যতটা পরিমাণে এই পুরুষোত্তমের পরিপূর্ণ মূর্ত্তির আভাস দিতে পারিয়াছেন, আর কেহ তাহা

পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। না পারারই কথা। কারণ আর কেউ ত এই জগতে, বিশ্বের চরমতত্ত্বকে অমন নিঃসঙ্কোচে আদর্শ-মানবাকৃতি এবং পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ মানবপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহস পান নাই।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় মহাজন-পদাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সখ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে বিস্তর প্রভেদ আছে। সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই রস অতি দুর্লভ বস্তু। রসবস্তুর দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—প্রথম এবস্তু তরল, দ্বিতীয় এবস্তু আনন্দময়। তরল বলিয়া এবস্তু সর্ব্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্ন, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। আর আনন্দময় বলিয়া এবস্তু যাহাতেই সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সুখময় ও উৎফুল্ল করিয়া তুলে। সর্ব্বসঞ্চারণশীলতা ও সর্ব্বানন্দদান, রসের মুখ্য ধর্ম্ম। সখায় সখায় সম্বন্ধ সংসারে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল সখ্য সম্বন্ধেতেই যে সখ্য-রস ফোটে, এমন বলিতে পারি না। এই সকল সম্বন্ধ সুখকর, ইহাও সত্য। কিন্তু এই সুখ সর্ব্বত্র সখাগণের দেহমনপ্রাণ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে না, ও তাঁহাদিগকে ছাপাইয়া উঠে না। এই জন্যই এসকলকে সখ্য রস বলিতে পারি না। সখ্য-সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সখার জীবনটা সখাময় হইয়া যায়। সখার পঞ্চেন্দ্রিয় তখন সখাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সখার মন তখন অবিরাম সখারই ধ্যান করে। সখার সুখদুঃখ তখন সখাকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। তখন তাহাদের দুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। তখন জাগ্রত ও সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও দূরে সকল স্থানে, ইহারা একে অন্যের মধ্যে বাস করে। এই রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, স্নায়ুমণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে, এক কথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে

গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষুসাক্ষাৎকার ব্যতীতও পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতিসাক্ষাৎকার ছাড়াও পরস্পরের শব্দ শোনে, বহিরিন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকার ব্যতীতও আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গলাভ করে। এই অবস্থালাভ হইলে, সখ্যরস সখ্যরতিতে পরিণত হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি। আর এই পরিণত অবস্থালাভ হইলেই সখ্যরসেতে, স্বেদকম্পপুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্বিকী বিকার প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন দেহ এবং আত্মাতে, ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে, শরীর ও অশরীরীতে মিশামিশি ও মাখামাখি হইয়া যায়। আত্মা তখন দেহধর্ম্ম ও দেহ তখন আত্মার ধর্ম্ম লাভ করে। আত্মা তখন দেহেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়া পড়ে; আর দেহ তখন আত্মাতে উঠিয়া, আত্মাতে লুপ্ত হইয়া যায়। এ যে অপূর্ব্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণনা হয় না। যে ভাগ্যবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের আস্বাদন পাইয়াছে, সে ঠারে-ঠোরেই তাহা যে কি, ইহা একটু আধটু বুঝিতে পারে। অন্যের নিকটে ইহা হেঁয়ালি মাত্র।

শৈশব-যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া যে সখ্য আস্বাদন করিয়াছিলাম, তাহা ত কেবল একটা মানস বস্তু নয়। সখা ত কেবল আত্মা ছিলেন না। তাঁর শরীর ছিল, তাঁর রূপ ছিল। তাঁর শব্দস্পর্শরূপরসে আমাদিগকে আকুল করিয়াছিল। তারই জন্য ত, ঐ রসের লোভে

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

সে ত আমাদের কেউ ছিল না। সোদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর হইয়াছিল। কুটুম্ব ছিল না, কিন্তু সকল কুটুম্ব অপেক্ষা বড় হইয়াছিল। তার মাকে মা ডাকিলে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তার বোনকে বোন বলিতে জীবন মধুময় হইত। কোনও

সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে তাহাকে বাঁধিবার জন্য অস্থির হইতাম।

সো নহে রমণ; হাম নহি রমণী

অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবার জন্য আকুল ও পাইয়া বিভোর হইয়া থাকিত। জাগিয়া তারই কথা ভাবিতাম। ঘুমাইয়া তারই স্বপ্ন দেখিতাম। সে যে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও বলিতে পারি না।

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণং সৌখ্যৈ দুঃখ্যান্যোপহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

—কোনও কিছু না করিয়াও কেবল কাছে থাকিয়াই সে যে আমাদের সকল দুঃখের উপশম করিত, সে যে আমাদের কি বস্তু ছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? যে এই অপূর্ব্ব বস্তুকে কেবল একটা নিরাকার অশরীরী আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কহে। যে ইহাকে কেবল একটা রক্তমাংসের স্নায়বীয় উত্তেজনা বলে, সে আরও বেশী মিথ্যা কহে। এই রসকে যে সকল প্রকারের শরীরধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত বলে, সে ইহা যে কি তাহা জানে না, তার ভাগ্যে এ বস্তুর আস্বাদনলাভ হয় নাই; অথবা জানিয়া শুনিয়া সত্যকথা ভাবিতে বা বলিতে তার সাহস হয় না। যে এই রসকে কেবল ইন্দ্রিয়বিকার বলিয়াই জানিয়াছে, সে'ও ইহার প্রকৃত আস্বাদন পায় নাই। অতীন্দ্রিয় হইয়াও এই রস ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ও আচ্ছন্ন করিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াও ইহা নিয়তই অতীন্দ্রিয়রাজ্যে যাইয়া লীলা করে। একথা যে বোঝে, যে জানে, যে বলে, সে'ই এই রসবস্তু যে কি, তার সত্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

এই রস ইন্দ্রিয়-সহায়ে বস্তুর অনুভব হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু

রস আর অনুভব বা feeling বাস্তবিক এক বস্তু নহে। অনু অর্থ পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম—পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারকে ইংরাজিতে perception কহে। এই perceptionএর পশ্চাৎ পশ্চাৎ'ই feelingএর উৎপত্তি হয়। এই feeling বা অনুভব অতি মামুলী বস্তু। সকল মানুষেরই এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীট-পতঙ্গেরই যে হয় না, এমন কথা বলা অসাধ্য। এবস্তু রস নহে। তবে রসবস্তু অনুভব বা feeling হইতে ভিন্ন হইলেও এই অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, অন্য কোনও প্রকারে হয় না। রস মাত্রেই অনুভবের অধীন, অনুভব-তন্ত্র। আর অনুভব মাত্রেই বস্তু-সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, বস্তুর অধীন, বস্তুতন্ত্র। এই জন্যই রসমাত্রেই বস্তুতন্ত্র। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত রস জন্মে না। তবে অনুভবে আর রসে প্রভেদ এই যে, অনুভব আপনার বিশিষ্ট আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় না, ছাড়িয়া বাঁচে না; রস যে অনুভবের আশ্রয়ে জন্মে সর্ব্বদাই সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়াইয়া বর্ত্তমান ও অতীত আরও বহুবিধ অনুভবকে জাগাইয়া তুলে। চক্ষু রূপই কেবল দেখে, শব্দও শোনে না, স্পর্শও পায় না, গন্ধও পায় না, আস্বাদনও করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু চক্ষু রূপ দেখিবা মাত্র তাহার পশ্চাতে যে অনুভব জন্মে, তাহা যখনই রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হইয়া উঠে। কেবল অনুভব রূপ মাত্র দেখে; তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপই "অপরূপ" হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহ্য রূপ থাকে না, মনোগ্রাহ্য, ধ্যানগ্রাহ্য, সমাধিগম্য "স্বপন-স্বরূপ" হইয়া উঠে।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূরসঞে লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশন লাগি জনু অন্তর জীবন রহ কিযে যাব॥

রূপ ত সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার দুই চক্ষু আছে তারই ত হয়, কিন্তু রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে? যে পড়ে, বুঝিতে হইবে তার রস জাগিয়াছে।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই না পারি॥
সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানি কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাও শ্যাম-দরশন পাইয়া কহিলেন:—

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোকভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা॥

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন একৈকেন্দ্রিয়স্পর্শে সর্ব্বেন্দ্রিয় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হয়।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো।
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো।
যুবতী ধরম কৈছে রয়।

একে বলে রস। এযে কেবল অনুভব বা feeling নহে, ইহাও কিআবার বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা feeling হইতেই এই রসের বা romanceএর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজেরই গাছ। অনুভব বা feeling'এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য্য। এই জন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোনও সত্য রসও জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অনুগমন করিয়া রসবস্তু জন্মে, ইহা যেমন সত্য; সেইরূপ এই রস জন্মিয়াই কেবল নিজেই যে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায়, তাহা নহে; ইন্দ্রিয়গ্রামকেও আপনার সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া তুলিয়া লয়, ইহাও সেইরূপই সত্য। রস-রাজ্যের একদিকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এবং অন্যদিকে আত্ম-বস্তু ও অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার। আর রসবস্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আনন্দের সেতু হইয়া আছে। আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা এই সত্যটা অতিশয় দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পীযূষপদাবলিতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে, শরীরে ও অশরীরীতে, দেহে ও আত্মাতে অমন অদ্ভুত মিশামিশি দেখিতে পাই। তারই জন্য এসকল অমৃতপদাবলি পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে, দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়া বসে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিশ্বযাত্রা

তন্দ্রামুগ্ধ মানব আমরা
জীবনের এপথ বাহিয়া
কি উদ্দেশ্যে জানিনা কোথায়
দ্রুতগতি চলেছি ছুটিয়া।

আঁধারের ঘন আবরণে
রয়েছে নয়ন দুটি ঢাকা,
কে জানে কোথায় লক্ষ্য কার
এপথ সরল কিংবা বাঁকা।

পশু, পক্ষী, লতা, ফুল, ফল,
উপবন, দীর্ঘিকা, অটবী
যাহা কিছু চারিদিকে হেরি
এত শুধু স্বপনের ছবি।

ভাল, মন্দ, কুৎসিত, সুন্দর,
কে নির্ধন, ধনী, মূর্খ, জ্ঞানী,
কে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক কেবা
যাহারে যে ভাবে হেথা জানি

ঘুমঘোর ভেঙ্গে যাবে যবে
প্রভাতের অরুণ কিরণে
কে জানে কিরূপে তারা সবে
দেখা দিবে আসি এ নয়নে।

সেই আলোকের দেশে বুঝি
ছুটিয়াছে বিশ্ব সবে লয়ে,—

পারিব কি না পারিব যেতে
কে আছে হেথায় দিবে কয়ে ?

ঊর্দ্ধে ওই গগনের গায়
রবি শশী নক্ষত্র নিচয়
কোন অস্তাচলে গেল ডুবে
হের অই আবার উদয়,

তটিনীর তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটিয়া চলেছে জলরাশি,
বক্ষে তার নাচিয়া নাচিয়া
চলেছে নির্ম্মাল্য ফুল ভাসি,

আকাশের অনন্ত প্রান্তরে
এলাইয়া নিবিড় কুন্তল
দিকে দিকে দিক আবরিয়া
ছুটিয়াছে কাদম্বিনীদল,

দিন ধায় মাস ঋতুকোলে,
মাস ঋতু বরষে লুকায়,
বরষ একটি দুটি করি
যুগে যুগে অনন্তে মিলায়।

এ জগতে যার দিকে চাই
না হেরি বিশ্রাম এক রতি—
দ্রুতপদে আপনার কাজে
ছুটিয়াছে অবিরাম গতি।

বিশ্বরথে চড়িয়া সকলে
চলিয়াছি কোন দেশ পানে
কে দিবে কহিয়া আজি মোরে
কে জানে সে নিবে কোন্‌খানে ?

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা

[২]

অনন্তর লক্ষ্মণসেনের দেহান্তে যবনগণ তদীয় পুত্র কেশবকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলে কেশব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণগণ যবনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এই দুঃসময়ে দনোজা মাধব যবনগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিলেন। একদা রাজা মাধব শুনিলেন যে, অরাজকসময়ে ব্রাহ্মণগণের কুলের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; তখন তিনি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া পাঁচশত আট জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন। এদিকে নির্ব্বাসিত কেশব, দনোজা মাধব গৌড়াধিপ হইয়াছেন শুনিয়া, গৌড়ে আসিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি তাঁহার পিতামহের আরাধিত ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া মাধব নৃপতির সভায় আগমন করিলে, রাজা মাধব কেশবকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় পার্ষদ করিলেন এবং তদীয় পরিজনবর্গের পরিপোষণের নিমিত্ত স্বত্ব ও ভূম্যাদি প্রদান করিলেন। একদা মহারাজ মাধব কথাপ্রসঙ্গে কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পিতামহ বল্লালসেন কিরূপ নিয়মে ব্রাহ্মণগণের কুলাকুল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন করুন। ইহা শুনিয়া কেশব শাস্ত্রজ্ঞ কুলপণ্ডিত এড়ু মিশ্রকে উত্তর করিতে আদেশ করিলে, তিনি বল্লালসেনের নির্দ্ধারিত কুলাকুল নিয়মসকল সবিস্তর বর্ণন করিলেন। অনন্তর মাধব নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া নবগুণবিচার, কুলগ্রন্থদর্শন ও চারিবার সমীকরণদ্বারা চব্বিশটি ব্রাহ্মণকে কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয়গণ শুদ্ধ ও কষ্ট এই

দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন; এক্ষণে তিনি শুদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। মাধব নৃপতি এইরূপে ব্রাহ্মণগণের কুলাচারাদি নির্দ্ধারণ করিয়া ১২১১ শাকে (১২৮৯ খৃঃ) পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার দেহান্তে পুনর্ব্বার মহাপরাক্রান্ত যবন ভূপতিগণের অত্যাচারে ব্রাহ্মণগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ের বর্ণনা করিয়া তন্ত্রার্ণবকার বলিতেছেন,—

"ততোমহাপরাক্রান্তৈর্যবনৈর্ভূমিপালকৈঃ।
পুনঃ প্রপীড়িতা বিপ্রা ন স্থাতুং শক্নুবন্তিতে॥
বরেন্দ্ররাঢ়দেশস্থাঃ সপ্তশত্যাখ্যকাস্তথা।
বিপ্রাস্তদৈক্যমাপন্না হিত্বান্যোন্যবিভেদনম॥
কুলাকুলবিচারঞ্চ শ্রেণীভেদস্তথৈব চ।
তত্যজুস্তে তদা বিপ্রাঃ কন্যাদানপ্রদানয়োঃ॥
বিধর্ম্মিণো যবনাস্ত বিপ্রাণাং ধর্ম্মনাশনে।
ন সমর্থা ভবেয়ুস্তে তেষামৈক্যগুণেন বৈ॥
এবং যবনভূপানাং শতবর্ষাতিরিক্তকম্।
কালং কষ্টেন বহুনা বিপ্রাস্তে হ্যতিবাহিতাঃ॥
ততো বিজিত্য যবনান্ কংসনারায়ণো নৃপঃ।
গৌড়দেশাধিপশ্চাভূদ্ মহাবলপরাক্রমঃ॥
সপ্রার্থিতোদ্বিজৈর্ভূপো বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে।
দত্তথাসাখ্যকামাত্যং ধর্ম্মনিষ্ঠমুবাচ হ॥
বিপ্রানাহূয় তূর্ণং ত্বং কুলগ্রন্থানুসারতঃ।
বিবিচ্য গুণদোষাদীন্ কুরু ত্বং কুলবন্ধনম্॥"

অর্থাৎ, পরে মহাবলপরাক্রান্ত যবন ভূপতিগণ ব্রাহ্মণগণের উপর পুনর্ব্বার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, তাঁহারা রাঢ়দেশে থাকিতে পারিলেন না। তখন বরেন্দ্রদেশীয়, রাঢ়দেশীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ একত্র

মিলিত হইয়া পরস্পর ভেদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা শ্রেণীভেদ ও কুলাকুল বিচার পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর আদানপ্রদানও করিতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহরা মনে করিলেন বিপ্রগণের একতাগুণহেতু বিধর্ম্মী যবনগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মনাশে সমর্থ হইবে না। এইরূপ যবনভূপতিগণের অধিকারে ব্রাহ্মণগণ শতবর্ষাধিককাল বহুকষ্টে অতিবাহিত করিলেন। পরে মহাবলপরাক্রম কংসনারায়ণনামা নৃপতি যবনদিগকে জয় করিয়া গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-গণ কুলবন্ধনবিষয়ে নৃপতিকে প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠ মন্ত্রী দত্তখাসকে বলিলেন, আপনি সত্বর ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া কুলগ্রন্থানুসারে তাঁহাদিগের গুণদোষ বিবেচনাপূর্ব্বক কুল-বন্ধন করুন।

এইরূপে রাজার আদেশ পাইয়া দত্তখাস মন্ত্রী রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ-গণকে আহ্বান করিলেন। তিনি দেখিলেন কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের সপ্তশতীসম্পর্ক ও স্থানভ্রংশহেতু মহান্ কুলবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চ গোত্র ছিল, এক্ষণে পরাশর, বশিষ্ঠ ও গৌতম এই তিনটি অতিরিক্ত সপ্তশতীর গোত্র প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে ছাপ্পান্নটি গাঁই ছিল, এক্ষণে কেয়াড়ী, পুংসিক, ভাদাড়ী, দীঘল, ভট্টগ্রামী ও পিতাড়ী এই অতিরিক্ত ছয়টি গাঁই প্রবেশ করায় সর্ব্বশুদ্ধ বাষট্টি গাঁই হইয়াছে। মন্ত্রী দত্তখাস ঈদৃশ বিপর্য্যয় দেখিয়া অতীব চিন্তিত হই-লেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কাচনা মুখবংশজ ধর্ম্মদাসের পুত্র শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণ বলিলেন, "মন্ত্রিবর! যবনগণের উৎপীড়নে ব্রাহ্মণগণ যখন স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত প্রচ্ছন্নভাবে বসতি করিতেছিলেন, তখন কুলরক্ষার নিমিত্ত বহু ঘটক নিযুক্ত করিয়া কুলাচার্য্যদ্বারা বহুবার সমীকৃত হইয়াছিলেন। আপনিও সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া কুলবন্ধন করুন।" এই বলিয়া তিনি উনপঞ্চাশ বার যে সমীকরণ হইয়াছিল তাহার ক্রম বর্ণনা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন কুলীন ব্রাহ্মণগণ যবন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নানাস্থানে

অবস্থান করিলেন, তখন গ্রামনামানুসারে তাঁহাদের সংজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে, যথা,—কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ, বাবলা বন্দ্যজ, নাপাড়া বন্দ্যজ, উন্দুরা বন্দ্যজ, সাগরদিয়া বন্দ্যজ ও গয়ঘড় বন্দ্যজ, এই ছয় প্রকার বন্দ্যজ; খনিয়া চট্টজ, পাটুলি চট্টজ, দেহাটা চট্টজ, এই তিন প্রকার চট্টজ; ফুলিয়া মুখজ, কাচনা মুখজ ও আমাটা মুখজ, এই তিন প্রকার মুখজ হইয়াছে।

কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিয়া মন্ত্রী দত্তখাস যাহা করিলেন, তাহা তত্ত্বার্ণবে এইরূপ বর্ণিত আছে; যথা,—

"এবং সমীকরণঞ্চ শ্রুত্বাশ্রীদত্তখাসকঃ।
বিচার্য্যগুণদোষাদীন্ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্॥
সমীকরণকং কর্ত্তুমুদ্যতঃ স স্বয়ং যদা।
তদা কাঁটাদিয়াবন্দ্যঃ শ্রীদাশরথিবংশজঃ॥
উবাচ দত্তখাসং তমীশানো দ্বিজসত্তমঃ।
আচারাদিনবগুণৈর্যুক্তা যে যে দ্বিজাতয়ঃ॥
পুরা বল্লালসেনেন কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তত্তদ্‌বংশীয়বিপ্রাণাং বহূনাঞ্চৈব সাম্প্রতম্॥
আচারাদিগুণানাস্তু লেশমাত্রং ন বিদ্যতে।
ইদানীন্তকুলীনানাং কুলাচার্য্যগতং কুলম্॥
গুণানাং নবসংখ্যানাং বিচারোনৈব দৃশ্যতে।
দোষাবহুবিধাঃপ্রাপ্তাঃ কুলীনানাং কুলেঽধুনা॥
কুলং গুণগতং জ্ঞেয়ং ন বংশগতমেব চ।
অতঃ পরীক্ষণং কৃত্বা গুণানাঞ্চৈব সাম্প্রতম্॥
ষট্‌পঞ্চাশদ্‌গ্রামিণাং বৈ কুরুত্বংকুলবন্ধনম্।
কুলাচার্য্যগণাঃসর্ব্বে বহবস্তু কুলীনকাঃ॥
শ্রুত্বা বাক্যং তদৈত দ্বিতন্মতং নাম্বমোদয়ন্॥"

অর্থাৎ মন্ত্রী দত্তখাস এইরূপ সমীকরণপ্রকার শ্রবণ করিয়া

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গুণদোষাদি বিচারপূর্ব্বক সমীকরণ করিতে যখন স্বয়ং উদ্যত হইলেন, তখন কাঁটাদিয়া বন্দ্য দাশরথির বংশজাত দ্বিজবর ঈশান দত্তখাসকে বলিতে লাগিলেন,—যাঁহারা আচার, বিনয় ও বিদ্যাদি নবগুণসম্পন্ন, পূর্ব্বে বল্লালসেন তাঁহাদিগকেই কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তত্তদ্‌বংশজাত বহুতর ব্রাহ্মণের আচারাদি গুণের লেশমাত্র নাই। এক্ষণে কুলাচার্য্যেরা যাঁহাদিগকে কুলীন বলেন, তাঁহারাই কুলীন হন; তাঁহাদের নবগুণের বিচার কিছুমাত্র দেখা যায় না। (বস্তুতঃ) কুলগুণগত, বংশগত নহে বুঝিতে হইবে; অতএব আপনি এক্ষণে ষট্‌পঞ্চাশদ্‌গ্রামী ব্রাহ্মণ-দিগের গুণসকলের পরীক্ষা করিয়া কুলবন্ধন করুন। দ্বিজবর ঈশানের এই বাক্য শুনিয়া কুলাচার্য্যগণ ও বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মত অনুমোদন করিলেন না।

মন্ত্রী দত্তখাস ঈশানের বাক্যে বহুব্রাহ্মণের অসম্মতি জানিয়া কুলীনদিগের সমীকরণপূর্ব্বক নবগুণসম্পন্ন আটটি মাত্র ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, যথা, (১) ফুলিয়া মুখজ বিদ্যাধর, (২) কাচনা মুখজ সদাশিব, (৩) অবসথী চট্টজ বলভদ্র, (৪) কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ আদিত্য ও (৫) দিগম্বর, (৬) কাঞ্জিজ বাসুদেব, (৭) গাঙ্গজ মাধব এবং (৮) পূতিজ বশিষ্ঠ।

মন্ত্রী দত্তখাস যখন এই আটটি মাত্র ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, তখন ইঁহাদিগের প্রত্যেকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া সভা হইতে উত্থিত হইলেন। কুলতত্ত্বার্ণবে; যথা,—

"যদৈব দত্তখাসস্তু ব্রাহ্মণানষ্টসংখ্যকান্।
নবধাগুণসম্পন্নান্ কুলীনানকরোত্তদা॥
ফুলিয়ামুখজশ্রীমন্ সিংহান্বয়জো বুধঃ।
বিদ্যাধরানুজশ্চৈব শ্রীগদাধরসংজ্ঞকঃ॥
কাচনামুখজঃ শ্রীমদ্দ্যাকরান্বয়জস্তথা।
সদাশিবস্যানুজশ্চ শ্রীমহেশ্বরসংজ্ঞকঃ॥

তথা কাঁটাদিয়াবন্দ্যশ্রীদাশরথিবংশজঃ।
আদিত্যানুজ ঈশানঃ শিবো দিগম্বরানুজঃ॥
অবসথীচট্টজশ্রীতেকড়িকুলসম্ভবঃ।
বলভদ্রানুজশ্রীমদ্রাঘবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ॥
পূতিশ্রীমচ্ছক্রপাণিসুত শ্রীদক্ষসংজ্ঞকঃ।
বশিষ্ঠস্যানুজশ্চৈব সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ॥
কাঞ্জিশ্রীমৎকামুবংশ্যানিরুদ্ধাখ্যক এব চ।
বাসুদেবানুজো বিদ্বান্ ব্রহ্মকর্ম্মবিশারদঃ॥
গাঙ্গশ্রীমচ্ছিশোর্বংশসম্ভূত কেশবাখ্যকঃ।
মাধবস্যানুজোধীরো বিপ্রাশ্চৈতেঽষ্টসংখ্যকাঃ॥
কুলীনকুলসম্ভূতাঃ সর্ব্বে বিদ্যাবিশারদাঃ।
আচারাদিগুণৈঃ পূর্ণা দোষসম্পর্কবর্জ্জিতাঃ॥
দত্তখাসসভামধ্যাদুদতিষ্ঠন্ মহৌজসঃ!"

অর্থাৎ, যখন দত্তখাস নবগুণসম্পন্ন আটজন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, (১) ফুলিয়ামুখজ নৃসিংহবংশজ বিদ্যাধরের অনুজ গদাধর, (২) কাচনামুখজ ত্যাকরবংশজ সদাশিবের অনুজ মহেশ্বর, (৩) কাঁটাদিয়া বন্দ্য দাশরথিবংশজাত আদিত্যের অনুজ ঈশান, ও (৪) দিগম্বরের অনুজ শিব, (৫) অবসথী-চট্টজ তেকড়িবংশজ বলভদ্রের অনুজ শাস্ত্রবিৎ রাঘব, (৬) পূতিজ চক্রপাণিপুত্র বশিষ্ঠের অনুজ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত দক্ষ, (৭) কাঞ্জিজ কামুবংশজাত বাসুদেবের অনুজ ব্রহ্মকর্ম্মনিপুণ বিদ্বান্ অনিরুদ্ধ এবং (৮) গাঙ্গজ শিশুবংশজ মাধবের অনুজ কেশব, এই আটজন কুলীনকুলসম্ভূত বিদ্যাবিশারদ আচারাদি নবগুণপূর্ণ দোষসম্পর্করহিত মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ দত্তখাসের সভা হইতে উত্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন স্বার্থ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে না, কারণ, তাঁহাদিগের বংশ কুলীন বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছিল। কেবল ঈশানের সমীচীন বাক্য অবলম্বিত হইল না

এই অন্যায় দেখিয়া তাঁহারা রোষে ও ক্ষোভে সভা হইতে উত্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগের উত্থান দেখিয়া বত্রিশ জন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। ইঁহাদিগের গাঁই ও নাম তত্ত্বার্ণবে সম্যক্ বর্ণিত আছে। যে চল্লিশ জন সভা হইতে উত্থিত হইলেন, তাঁহাদিগের গাঁই সংখ্যা বাইশটি মাত্র ছিল। তাঁহাদিগের সগর্ব্বে উত্থান দেখিয়া দত্তখাস ক্রুদ্ধ হইলেন। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বার্ণবকার বলিতেছেন; যথা,—

"দৃষ্ট্বা নির্গমনং তেষাং চত্বারিংশদ্দ্বিজন্মনাম্।
ক্রোধাবিষ্টো দত্তখাসঃ প্রোবাচ দ্বিজপুঙ্গবান্॥
মমাবমাননাং কৃত্বা গতা যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
মচ্ছাসনাদ্ভবদ্ভি র্ন ব্যবহার্য্যাঃ কদাচন॥
দত্তখাসস্য চাদেশং শ্রুত্বাতে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
দ্বাবিংশতিগ্রামিণাঞ্চ চত্বারিংশন্মিতাস্তদা॥
নৃপতেরপ্রিয়ৈর্ভূত্বা স্বজ্ঞাতীনাং বিশেষতঃ।
বাসোনৈববিধেয়ঃ স্যাদিত্যন্যোন্যং বিচার্য্য চ॥
বিহায় রাঢ়দেশঞ্চসদাকলহশঙ্কয়া।
অবাচীংকঙ্কুভং জগ্মুর্ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ॥
রাঢ়োড্রয়োর্মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ।
তদাপ্রভৃতি তে সর্ব্বে চত্বারিংশদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥
মধ্যশ্রেণীতিবিখ্যাতা মধ্যদেশনিবাসতঃ॥

অর্থাৎ, সেই চল্লিশ জন ব্রাহ্মণের নির্গমন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট দত্তখাস অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "যে ব্রাহ্মণগণ আমার অবমাননা করিয়া চলিয়া গেলেন, আপনারা তাঁহাদিগের সহিত কদাচ ব্যবহার করিবেন না।" দত্তখাসের এই আদেশ কর্ণগোচর হওয়ায় ২২-গ্রামী চল্লিশ জন ব্রাহ্মণ পরস্পর বিচার করিলেন যে, রাজার,

বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় হইয়া আমাদের এ দেশে বাস করা বিধেয় নহে; সর্ব্বদা কলহের ভয়ে তাঁহারা রাঢ়দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া রাঢ় ও উড্রের মধ্যবর্ত্তী দেশে বাস করিলেন। তদবধি সেই চল্লিশ জন সদ্ব্রাহ্মণ মধ্য-দেশে নিবাস হেতু মধ্যশ্রেণী এই নামে বিখ্যাত হইলেন। 'মধ্য-শ্রেণী' এই নামটি ইঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; কিন্তু 'মধ্যদেশী রাঢ়ীয়' এইটিই সম্পূর্ণ পরিচয়। নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় 'মধ্যদেশী' শব্দেরই প্রয়োগ আছে। ইহা সমীচীনও বটে, কারণ, তাহা হইলে 'মধ্য' এই শব্দটির 'মধ্যদেশ' এই অর্থ বিকৃত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। অতএব, অতঃপর মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াই বিধেয়, আলস্যবশতঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া পরিচয়ের অর্থকে বিকৃত হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

পূর্ব্ব ইতিবৃত্তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মধ্যদেশী রাঢ়ীয় সমাজে মুখোটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট, পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল ও গাঙ্গুলি এই ৬-গ্রামী ব্রাহ্মণ কুলীনকুলসম্ভূত এবং পারিহাল, বটব্যাল, কুলভী, কেশরকোনি, মাশ্চটক, পলশায়ী, গুড়, তৈলবাটী, হড়, পালধি সিমলায়ী, চোৎখণ্ডী, মহিন্ত্যা, পিপ্পলী, ঘোষাল ও সাগুেশ্বরী, এই ১৬-গ্রামী ব্রাহ্মণ সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের বংশধর। মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়োপলক্ষ্যে সমগ্র সমাজকে আহ্বান করার নাম 'বাইশী' করা। পূর্ব্বোক্ত ২২-গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করাই যে এই 'বাইশী' শব্দের অর্থ তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। যদিও এক্ষণে উক্ত সমাজে ২২ গাঁই বহির্ভূত ব্রাহ্মণও প্রবেশলাভ করিয়া-ছেন, তথাপি 'বাইশী' শব্দটি রূঢ়ি অর্থ লাভ করিয়া অবাধে প্রচলিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ হইতে চলিয়া গেলেন শুনিয়া মন্ত্রী দত্তখাস পুনর্ব্বার রাঢ়দেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া দেশ ও কালানুসারে গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুলনিয়ম প্রবর্ত্তন করি-

লেন। এইরূপে কুলপ্রথা* নির্দ্ধারণ করিয়া পূতিবংশসম্ভূত—কাক, মনোহর, শোভাকর, প্রভাকর ও বিভাকর এই পাঁচ জনকে কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩২৫ শাকে (১৪০৩ খৃঃ) ব্রাহ্মণগণের সম্মতি অনুসারে সুবিজ্ঞ শোভাকরকে কুলাচার্য্যপদে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর কংশনারায়ণের লোকান্তর হইলে তদীয় পুত্র যদু রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং যবনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন যবনগণের পুনর্ব্বার উপদ্রব বাড়িয়া উঠিল। তাহারা ব্রাহ্মণগণের জাতিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণের গৃহ হইতে বেদ, পুরাণ ও কুলগ্রন্থসকল আনিয়া ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণের অনেকে পুনর্ব্বার গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এই দুর্দ্দিনে বহুতর ব্রাহ্মণ জাতি, ধর্ম্ম ও কুল হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। পরে ১৪০০ শাকে (১৪৭৮ খৃঃ) একজন যবনবংশীয় ভূপতি গৌড় অধিকার করিলেন। তিনি যবন হইলেও হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া অভয় প্রদান করিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা জানাইলে তিনি বন্দ্যজ দেবীবরকে কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলেন। এই যবন ভূপতি হোসেন সা বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ইঁহারই বিচক্ষণ মন্ত্রিদ্বয় সাকর মল্লিক ও দবীর খাস অর্থাৎ রূপ ও সনাতন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মণ লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া গৌড়ের নিকট রামকেলিগ্রামে আগমন করেন, সেই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,—

"গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনিদানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোঁসাঞা ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

কাজী যবন ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন॥

চৈঃ মঃ ১ম পঃ

দবীর খাসের ব্রাহ্মণপ্রিয়তা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

" * * * কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শ্রাস্ত্রের বিচার॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া॥"

চৈঃ মঃ ১৯শ পঃ

এইরূপে দেবীবর কুলাচার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু কুলগ্রন্থসকল ও বংশাবলী কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না, কারণ, যবনেরা ঐ সকল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়াছিল। এদিকে কুলীনদিগের কুলে বহুদোষস্পর্শ ঘটিয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে মহাপীঠ কামরূপে গমন করিয়া তিন পক্ষকাল একাগ্রচিত্তে কামাখ্যাদেবীর আরাধনা করিলেন। দেবী প্রসন্না হইলেন। তন্ত্বার্ণবে; যথা,—

"ততঃ প্রসন্না সা দেবী বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে।
দেবীবরে বরং প্রাদাৎ ত্রিকালজ্ঞো ভবেতি চ॥
কুলাচার্য্যগণৈঃ সাকং সংমন্ত্র্য বিবিধং পুনঃ।
দোষাণাংতারতম্যঞ্চ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্॥
দেবীবরপ্রসাদেন বিশেষেণাবলোক্য চ।
দ্বিথবেদেন্দুমে শাকে মেলবন্ধং চকার-সঃ॥
একত্র কুলদোষাণাং বহূনাঞ্চৈব মেলনাৎ।
বন্দ্যদেবীবরেণৈব মেল ইত্যুচ্যতে তদা॥"

অর্থাৎ, পরে কামাখ্যাদেবী প্রসন্না হইয়া দেবীবরকে বর দিয়া বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও। পরে

দেবীবর কুলাচার্য্যগণের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া দেবীর বরপ্রভাবে কুলীন ব্রাহ্মণগণের দোষের তারতম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া ১৪০২ শাকে (১৪৮০ খৃঃ) মেলবন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। বন্দ্যজ দেবীবর বহুকুলদোষের একত্র মেলন করিলেন বলিয়া দোষমেলনের "মেল' সংজ্ঞা হইল।

দেবীবর মেলকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিলেন,—যথা,— প্রকৃতি, তদ্‌গ্রাস, প্রকৃত্যুপাধি ও তদ্দোষ। অনন্তর প্রকৃতিকে ২২, তদ্‌গ্রাসকে ৬, উপাধিকে ৩ ও তদ্দোষকে ৫ প্রকারে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ছত্রিশটি মেলের আবির্ভাব হইল।

পরে দেবীবর মেলবন্ধন করিতে করিতে অবশেষে মধ্যদেশে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

তত্ত্বার্ণবে; যথা,—

> "মেলবন্ধবিধানেচ্ছুঃ প্রত্যাখ্যাতোমহামনাঃ।
> দেবীবরস্তদাতেষাং মুখ্যৈর্মধ্যনিবাসিনাম্॥
> শুদ্ধানাং নোমেলবন্ধোবিফলোন্যূনতাপ্রদঃ।
> ত্রিকালজ্ঞেন ভবতা কিমর্থমনুভূয়তে॥"

অর্থাৎ, তখন মধ্যদেশনিবাসী মুখ্যব্রাহ্মণগণ মেলবন্ধনে ইচ্ছুক দেবীবরকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, আমরা বিশুদ্ধই আছি, সুতরাং আমাদিগের মেলবন্ধের প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু মেলবন্ধ হইলে আমরা ন্যূন অর্থাৎ আমাদিগেরও দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে লোকে এইরূপ বুঝিবে; অতএব আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও আমাদিগের মেলবন্ধনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন কেন?

এইরূপে দেবীবর প্রত্যাখ্যাত হইয়া মধ্যদেশ হইতে চলিয়া যান। প্রত্যাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ আমি আমার "মধ্যদেশী-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বা মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। অনন্তর দেবীবরের দেহান্ত হইলে ১৪০৭ শাকে

(১৪৮৫ খৃঃ) ধ্রুবানন্দ মিশ্র অর্থাৎ গ্রন্থকারের পিতা কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মেলকারিকা প্রণয়ন করেন। এক্ষণে কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা দুইপ্রকার ইতিহাস দেখিতে পাই ; একপ্রকার বিদ্যমান-বস্তুতন্ত্র ও অন্যপ্রকার অবিদ্যমান-বস্তুতন্ত্র। ইতিহাসে যাহা লিখিত আছে, যদি তাহা বর্ত্তমানকালে বিদ্যমান বস্তুর সহিত মিলাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা বিদ্যমানবস্তুতন্ত্র, সে ইতিহাসকে অপ্রমাণ বলা যায় না। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূরের সময় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ এ দেশে ছিলেন ; পরে মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের পুত্রগণের মধ্যে প্রথমতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই বিভাগ হয় এবং পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় এই দুই অবান্তর বিভাগ সংঘটিত হয়। বল্লালসেনের নিকট তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাঁহাদিগের সমীকরণ হইয়াছিল এবং দেবীবর তাঁহাদিগের মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সপ্তশতী, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে স্বচক্ষে দেখিতেছি এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য, সমীকরণ ও মেলের চিহ্নগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছি। আরও, পঞ্চব্রাহ্মণের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণের অনেকের লিপিবদ্ধ আমূল বংশাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং এই বিষয়গুলি প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কুলগ্রন্থই অখণ্ডনীয় প্রমাণ, অন্য প্রমাণের অণুমাত্র আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যদি শিলালিপি বা তাম্রশাসনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের নামটিও প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল প্রমাণের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের আভ্যন্তরীণ ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস কুলগ্রন্থ ব্যতীত আর নাই বলিলেই হয়। সত্য বটে কুলগ্রন্থসকলের মধ্যে অবান্তর বিষয় লইয়া কিছু কিছু

বৈসাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাহাতে মূল বিষয়ের কোন ক্ষতি হয় না। যখন একজন ব্যক্তি একই বিষয় দুইবার লিখিতে গেলে অল্পাধিক বৈলক্ষণ্য হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কোন বিষয় লিখিতে গেলে তাহার মধ্যে যে কিছু কিছু প্রভেদ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহাতে কুলগ্রন্থসমূহের প্রতিপাদ্যবিষয়ে ঐতিহাসিকতার বিশেষ হানি হয় না। ইংলণ্ডে এরূপ তাম্রশাসন বা শিলালিপির কথা শ্রুত হওয়া যায় না, কিন্তু সেদেশে ইতিহাসের অভাব নাই এবং ইতিহাসসমূহের মধ্যে অবান্তর বিষয়ে অনৈক্যেরও অভাব নাই; তাহা বলিয়া সেগুলি ইতিহাস নয় বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, প্রত্যুত ইংরেজ জাতির জাতীয় ইতিহাস বলিয়া সাদরে অধীত হইয়া থাকে। স্থূল কথা, যে ইতিহাসের বর্ণিত বিষয় ধারাবাহিকরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাকে অপ্রমাণ বলা যায় না। যে ইতিহাসের বর্ণিত ঘটনা সুদূর অতীত কালে ঘটিয়াছে, যাহার ধারাবাহিক চিহ্ন বর্ত্তমান কালে দৃষ্টিগোচর করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই অবিদ্যমানবস্তুতন্ত্র, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে সমসাময়িক নিদর্শনের প্রয়োজন। যিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কে এবং তদীয় জীবনবৃত্তান্ত কি, বল্লালসেন বা লক্ষ্মণসেন কোন্ সময়ের লোক, যদি তাঁহারা রাজা ছিলেন, তবে তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, কিরূপ নিয়মেই বা তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন ইত্যাদি অসংখ্য রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় মুদ্রা, শিলালিপি বা তাম্রশাসনাদির সাহায্যে অনেকটা অসংশয়িতরূপে স্থির করিতে পারা যায়। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের যে সকল অংশ ঐ সকল প্রমাণের সহিত মিলিবে, সেই সকল অংশকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবার বাধা থাকিবে না।

আলোচ্যমান কুলতত্ত্বার্ণবে কয়েকটি রাজার ও রাজ্যের নাম এবং কাহার কাহার শাসনকালের উল্লেখ আছে মাত্র; রাজ্যসংক্রান্ত বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। ঐ গুলির মধ্যে কাহারও নাম বা

রাজত্বকালের কিছু ইতর বিশেষ হইলেও প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না। তথাপি ঐ গুলির বর্ণনায় কতটুকু ঐতিহাসিকতা আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে শূরবংশের অস্তিত্বের প্রমাণ পান নাই; কিন্তু তিনি বল্লালকে শূরবংশের দৌহিত্র বলিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে একটা শূরবংশ না থাকিলে বল্লাল ঐ বংশের দৌহিত্র হইলেন কিরূপে? তত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে আদিশূর ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার যোগ্য সমুচিত প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই; তবে বংশাবলীর সাহায্যে মোটামুটি কতকটা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশে দাশরথিসন্তান গৌরীকান্তের ধারায় ভট্টনারায়ণকে ১ ধরিয়া এক্ষণে ৩৭।৩৮ পুরুষ দেখা যাইতেছে। যদি প্রত্যেক পুরুষ গড়ে ত্রিশ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে ১১৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে অনুমিত হয় ইহার সহিত ৭৫৩ যোগ দিলে যোগফল ১৮৯৩ হয়; সুতরাং মোটামুটি বিংশ শতাব্দীতে আসিয়াই পড়ে। দ্বিতীয় বিচার্য্য এই যে, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন কি না, যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই আদিশূর বলিয়া অনুমান করিতে হয়। রাজাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি ইতিহাসে বিরল নহে। পৌরাণিক যুগে অর্জ্জুনের নাম ফাল্গুনি, ধনঞ্জয় ও পার্থ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; ভীমও বৃকোদর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; দেবব্রত ভীষ্ম-নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও এক ব্যক্তির একাধিক নাম বিরল নহে। নাটকাদিতে চাণক্য কৌটিল্য নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং সেলিমও জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আদিশূর অন্য কোন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিলে একান্ত অযৌক্তিক হয় না। আদিশূর যখন কামরূপ জয় করেন, তখন রাজভট বা

তদ্‌বংশীয় কেহ কামরূপের রাজা ছিলেন। ইহা হইতেও তাঁহার কাল নিরূপণের কিছু সাহায্য হইতে পারে। যদি আদিশূর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ভূশূর মগধেশ্বর ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন ইহা একান্ত বিরুদ্ধ হয় না। আদিশূর বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে; ইহাতে অসম্ভব মনে করিবার কিছুই নাই; কারণ, দেবপাল হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ ও পশ্চিম-সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব-সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন এইরূপ তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং ইহা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে আদিশূরের দিগ্‌বিজয় বিশ্বাসের অযোগ্য হইবে কেন? আর এক কথা কোলাঞ্চই যে কান্যকুব্জ তাহা তত্ত্বার্ণবের বচনদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে; কারণ কান্যকুব্জ ও কোলাঞ্চ এই উভয় শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের পর শূরবংশের ইতিহাস রাঢ়দেশে আবদ্ধ ছিল; সুতরাং সোমশূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব গৌড়েশ্বরের তুলনায় ক্ষীণ হইয়াছিল। গৌড়ে সেনবংশের প্রভাব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবার পর বিজয়সেনের সহিত শূরবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তত্ত্বার্ণবে বর্ণিত আছে বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে কুল-মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বহু তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ তাম্রশাসন অদ্যাপি একটিও পাওয়া যায় নাই, ইহাতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে না; তবে আবিষ্কৃত না হইবারও একটি প্রবল কারণ আছে। তত্ত্বার্ণবে বর্ণিত আছে যে, যবনগণ ব্রাহ্মণগণের গৃহ হইতে বহু ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও কুলগ্রন্থ আনিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতেই মনে হয়, যে সকল তাম্রশাসন তাহাদিগের হস্তে পড়িয়াছিল তাহা তাহারা গলাইয়া তাম্রমুদ্রায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে ইহাও একান্ত অসম্ভব নহে। তাম্রশাসনসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ

হইতেছে। যখন মুদ্রা জাল হয় দেখা যাইতেছে, তখন তাম্রশাসনও জাল হইতে পারে। যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মুদ্রা জাল করিতে পারে, সে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া বর্ত্তমানকালে প্রাচীন কালের মুদ্রা জাল করিয়া প্রাচীন বস্তু বলিয়া প্রচার করিতে পারে। তাম্রশাসনসম্বন্ধেও একথা খাটে। যে ব্যক্তি জাল করিবে, সে অক্ষরতত্ত্বেরও অনুসন্ধান রাখিবে সন্দেহ নাই। আরও, তাম্র-শাসন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের একটি প্রধান উপাদান ও মূল্যবান্ বস্তু ইহা যতই প্রচারিত হইবে, ততই অসংখ্য তাম্রশাসন দেখা দিতে থাকিবে; তখন তাম্রশাসনকে শাসন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাম্রশাসন হইলেই 'বেদবাক্য', লিখিত পুস্তক হইলেই অসার, একথা যুক্তিযুক্ত নহে। খাঁটি জিনিষ হইলে উভয়ই আদরের বস্তু।

তন্ত্রার্ণবের মতে দনোজা মাধব খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিছুকাল এদেশে অরাজকতা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রার্ণবে অন্ধ্রবংশীয় শূদ্রক ও কংসনারায়ণ নামক রাজার উল্লেখ আছে। তাঁহাদিগের অস্তিত্ব উড়াইয়া না দিয়া ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলে যাথার্থ্য অন্য প্রমাণদ্বারা কালে সমর্থিত হইতে পারে। রাখালবাবু কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত ও মূল্যবান্ বোধ হওয়ায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখি-য়াছেন,—"কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই মত সমর্থন করিয়াছেন (মানসী, মাঘ, ১৩২১। আদিশূরনামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটিয়াছিল, এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, শ্যামল বর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপরে স্থাপিত।"—বাঙ্গালার ইতি-হাস, ১ম ভাগ, ২৪৪ পৃঃ।

এক্ষণে তন্ত্বার্ণবে বর্ণিত রাজা ও যৎকিঞ্চিৎ রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়-সকলের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, আবিষ্কৃত অকৃত্রিম মুদ্রা, শিলালিপি বা তাম্রশাসনদ্বারা তন্ত্বার্ণবের যে যে বাক্য সমর্থিত হইবে না, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহি; কিন্তু যতদিন না বিরোধী প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়, ততদিন আমরা ইহার মত প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত নহি। রাখালবাবু নিজেও যখন পরবর্ত্তী সমীচীন প্রমাণের বলে কোন কোন পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও তাদৃশ পথ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক নহি। তবে এ কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, কোন লিপিবদ্ধ বিষয়সম্বন্ধে অদ্যাপি মুদ্রা, তাম্রশাসন বা শিলালিপি পাওয়া যায় নাই বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্তকে আমরা ভ্রান্ত বা একদর্শী সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করি।

আর দুই একটি কথা বলিয়া আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসানকাল পর্য্যন্ত আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের ও তাঁহাদের বংশধরগণের যে ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে, সহোদর দুই ভ্রাতা যদি ভিন্ন দেশে বসতি করে, তবে কিছুদিন পরে তাহাদের সন্তানেরা পরস্পরকে আর চিনিতে পারে না। যতই দিন যায়, ততই তাহারা পরস্পরকে আত্মীয় মনে করা দূরে থাকুক, বরং শত্রু ও নিজ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে। ইহা অপেক্ষা মহামোহ আর কি হইতে পারে? কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের সন্তানেরা এক্ষণে বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে শত্রুভাবে আক্রমণ করিতেছেন। ইহা অতি শোচনীয় দৃশ্য সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রাতৃবিরোধের যে ফল ফলিয়াছে,

এক্ষণেও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণসমাজ দিনে দিনে সেই শোচনীয় ফলের সম্মুখীন হইতেছে। এই ভ্রাতৃবিরোধের ফলেই যদুবংশের ধ্বংস হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।) অহমিকা প্রত্যেক বিভক্ত সমাজের চক্ষুকে এরূপ অন্ধীভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব দোষ-পরীক্ষা ও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া অপরের নিন্দাবাদে কণ্ঠকে ঘর্ঘর করিয়া তুলিতেছে। ইহা সমাজসংস্কারের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে। অপরের নিন্দাবাদ করিলেই স্বীয় দোষের ক্ষালন হয় না। এই নিমিত্ত যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর সমাজমুখ্যগণের তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ বিবাহবিভ্রাট যেরূপ সর্ব্বোচ্ছেদিনী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তাহাতে তাহা পূর্ব্বোক্ত যবন-বিভ্রাট অপেক্ষা ক্ষীণশক্তি বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং এই তিন সমাজে যাহাতে বিশুদ্ধতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষিত হয় এবং মনূক্ত ব্রাহ্মবিবাহের অর্থাৎ পণ-বিরহিত বিবাহের প্রচলন হয়, তদ্‌বিষয়ে সমাজমুখ্যগণের সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা' যদি নামে না হইয়া কার্য্যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত সভা হইতে বহু সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ।

নাটুকে রামনারায়ণ

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গলা ভাষায় আটখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে শুধু 'শকুন্তলা' ছাড়া তাঁহার 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব,' 'বেণীসংহার,' 'রত্নাবলী,' 'নবনাটক,' 'মালতী-মাধব,' 'রুক্মিণীহরণ,' ও 'স্বপ্নধন' নামে এই সাতখানি নাটক একবার আমার হাতে আসিয়াছিল। সেই সময় এই বহি কয়খানি পড়িয়া বাঙ্গালার দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরে উহা প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহা হইল না। 'নারায়ণে' সম্প্রতি রামনারায়ণের কথা বাহির হইতেছে দেখিয়া সে লেখাটি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। মনে হইল, এইরূপ যেটুকু যাঁহার জানা আছে, সেইটুকু বিলম্ব না করিয়া সাধারণকে তাঁহার জানাইয়া রাখাই উচিত;—তাহাতে বঙ্গীয় দৃশ্যকাব্যের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস-সঙ্কলনের পথ শীঘ্রই সুগম হইতে পারে।

বাঙ্গলা নাটকের বয়স খুব বেশী না হইলেও ইহার আদিযুগের সকল কথা যে ঠিক জানিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না। এমন কি, ইহার মধ্যযুগে—অর্থাৎ ষাট বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় নাটক-রচনার চেষ্টা কেমনভাবে চলিয়াছিল, কয়জন লেখক কয়খানা বহি তখন নাটক নাম দিয়া চালাইয়াছিলেন, এসব কথারও বেশ একটা মোটামুটি বিবরণ আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। অন্যের কথা দূরে যাউক, স্বয়ং রামনারায়ণের সম্বন্ধেও সচরাচর অনেক লেখককে অনেক ভুল লিখিতে দেখিয়া থাকি। তিনি 'স্বপ্নধন' নামে যে একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকের ইতিহাসে এমন খবরটাও বরাবর বাদ পড়িয়া আসিতেছে। অতএব,

বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হইতে এখনও যে অনেক বাকী, সত্যের খাতিরে তাহা বলিতেই হইবে।

তবে এ অসম্পূর্ণ ইতিহাস যে কেবল ভ্রম-প্রমাদেই পূর্ণ, অবশ্য এমন কথাও বলি না। প্রচুর না হউক, প্রকৃত তথ্যের তাহাতে অভাব নাই। সে তথ্য ভুলের পর ভুল সংশোধিত হইয়া ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে। আজকাল যাঁহারা বাঙ্গলা নাটকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অবশ্য পরের অনুসন্ধানের ফল নিজেদের বলিয়াই চালাইয়া যান,—কাহার কোন্ ভুলটার কে কবে সংশোধন করিল তাহার উল্লেখটুকু করাও কর্ত্তব্যবোধ করেন না। কিন্তু একের প্রাপ্য গৌরব অন্যে ফাঁকি দিয়া ভোগ করিবে, এ সঙ্কীর্ণতা সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে শোভনীয় নহে এবং উপেক্ষার যোগ্যও নহে। সেইজন্য রামনারায়ণের নাটকের কথা তুলিবার পূর্ব্বে আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ ভুল-সংশোধনেরও একটি বিবরণ দিব। যে বিষয়েরই হউক, ইতিহাস-সঙ্কলনের উহাও একটা অঙ্গ বলিয়া বোধ করি।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, রামনারায়ণের সময় নাটক-নামাঙ্কিত বাঙ্গলা বহির সংখ্যা কত ছিল, তাহার ঠিক খবর না পাইলেও এটুকু জানা গিয়াছে যে উহা চৌত্রিশখানির কম ছিল না। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বের এক মাসিকপত্রে একথার প্রমাণ আছে। ১৭৮২ শকাব্দের "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় রামনারায়ণের "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"কয়েক বৎসরাবধি এতদ্দেশে নাটকের পুনরুদ্দীপন-প্রসঙ্গে সাধারণ জনগণের অনুমোদন হইয়াছে, এবং সেই অনুমোদন-বারির প্রভাবে ন্যূনকল্প চত্বারিংশৎখানি নাটক আমরা পাঠ করিয়াছি।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব গ্রন্থের নামটুকু জানিবারও এখন উপায় নাই। 'একান্ত কাব্য-রস-বিহীন যৎসামান্য রচনা'-বোধে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" ইহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। শুনিতে পাই, ঈশ্বর গুপ্তও নাকি এই সব নাটকের নামে নাসিকা

কুঞ্চিত করিতেন। বলিতেন যে, "এগুলা না—টক, না—মিষ্টি।" কিন্তু সমসাময়িকের বিচার অনেক সময়েই নির্দ্দোষ হইতে দেখা যায় না। কে বলিতে পারে, ঐ অনাদৃত উপেক্ষিত বহিগুলার মধ্যেই হয় ত এমন এক-আধখানা বহি ছিল, যাহা দেখিলে হয় ত আমরা ধরিতে পারিতাম যে রামনারায়ণের নাট্য-শক্তির উন্মেষ-পক্ষে তাহা সহায়তা করিয়াছে। তবে সে সব গ্রন্থ যখন পাওয়া যায় না, তখন এ সম্বন্ধে এখন জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।

বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রিত নাটক কোন্‌খানি, এই প্রশ্নের উত্তর লইয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে এখন বিশেষ কোন মতভেদ হইতে দেখি না, পূর্ব্বে কিন্তু এমন ছিল না। প্রথম প্রথম অনেকেই জানিতেন, রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'ই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রিত নাটক। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকে ঐ মতই প্রথম প্রচারিত হয়।—সেই হইতে সাধারণের মনে ঐ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন এ মত টিকিতে পারে নাই। ঠিক উহার পাঁচবৎসরকাল পরে, মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা"য় বলেন,—"ভদ্রার্জ্জুন নাটক বাঙ্গলা ভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলা ভাষায় দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম 'ভানুমতী চিত্ত-বিলাস,' তাহা সেক্সপীয়ারের 'মারচেণ্ট্‌ অব্‌ ভিনিস' নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত।"

কিন্তু এই "ভদ্রার্জ্জুনে"র পূর্ব্বেও যে বঙ্গভাষায় নাটক-নামাঙ্কিত মুদ্রিত পুস্তকের অস্তিত্ব ছিল, সে সংবাদ আমরা শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় নামক একজন লেখকের লেখা হইতে জানিতে পারিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"১২২৮ সালে 'কলি-রাজার যাত্রা' নামক একখানি নাটকের সমালোচনা রাজা রাম-

মোহন রায়ের 'সংবাদ-কৌমুদী' নামক বাঙ্গালার তৃতীয় সংবাদপত্রে হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল কি না জানা যায় নাই। বাঙ্গালার দ্বিতীয় নাটক 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' বা 'বিদ্যাসুন্দর'। এই বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' ঠিক কোন্ সালে রচিত বা কোন্ সালে প্রথম ছাপা হয়, তাহা জানিতে পারি নাই। ১২৩৮ সালে কলিকাতা শ্যামবাজারে ৺নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় বাঙ্গালীদ্বারা আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত রামগতি তর্করত্নের 'মহানাটক' প্রভৃতি ১২৫৬ সালে ও তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত হয়। তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক এবং হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' উহাদেরও পরবর্ত্তী।"—এ সংবাদের পরে 'পরিষৎ-পত্রিকা'র মারফতে আর একখানি পুরাতন পুস্তকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুস্তকখানির নাম—প্রেমনাটক। পরিষৎ-পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'প্রেম-নাটকে'র পরিচয়কল্পে লিখিত হইয়াছে,—"বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত নাটক—'প্রেমনাটক' (পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত)—১৮২০ সালে মুদ্রিত। ক্ষুদ্র পুস্তক। ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। আরম্ভে 'গুণক ছন্দে' গণেশবন্দনা ও 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী-বন্দনার পর—'কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রূকুটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দ-কুসুমদশনা কোমলরসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রূকামধনুগঞ্জনা গৃধিনীশ্রবণা' ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণরাজি একটানা স্রোতে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারা যায় না। শেষ—

অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম করো না কখন॥

কহিলাম সার কথা কর প্রণিধান।
প্রেমনাটক গ্রন্থ হইল সমাধান॥
সমাপ্ত।

ভাষা পদ্য গদ্য। পয়ার ত্রিপদী ত আছেই; তা'ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাপতরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা।"

যাহা হউক, এই 'প্রেম-নাটকে'র চেয়ে পুরাতন আর কোনও মুদ্রিত নাটকের নাম আজ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই;—এই বহিখানিই বাঙ্গালার আদি নাটক বলিয়া আজকাল বিঘোষিত হইতেছে। তবে এ কথায় এমন কেহ ভাবিবেন না যে, 'প্রেমনাটকে'র পূর্ব্বে এদেশে নাটক-রচনার কোনও চেষ্টাই একেবারে হয় নাই। স্বয়ং ভারতচন্দ্রও যে একবার 'চণ্ডী নাটক' নামে একখানি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে অতিকষ্টে গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। গতবর্ষের 'নারায়ণ'পত্রে "বাঙ্গালার আদি নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধে গুপ্ত-কবির ঐ অনুসন্ধানের ফল না বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে দেখিলাম। সুতরাং এখানে আর চর্ব্বিত চর্ব্বণের পুনশ্চর্ব্বণ করিয়া কাগজের স্থান নষ্ট করিব না। এবারে রামনারায়ণের কথা আরম্ভ করা যাউক।

রামনারায়ণকে আদি নাট্যকার বলিতে না পারিলেও তাঁহাকে বর্ত্তমান বাঙ্গলা নাটকের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিলে বোধ করি তেমন অন্যায় হয় না। মাইকেল মধুসূদনও এক্ষেত্রের একজন পথ-প্রদর্শক বটে, কিন্তু প্রথম নহেন। রামনারায়ণের রচনায় আমরা বর্ত্তমানের শাখা-প্রশাখাময়ী নাট্যকলার অধিকাংশ অঙ্গেরই অঙ্কুর দেখিতে পাই। তিনি যে সময়ে অপোগণ্ড নাট্যকলার লালন-পালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্যসত্যই উহা পিতৃমাতৃহীনা

বালিকার মত অনাদৃতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা। সেই সময়ে তাঁহার মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত ইহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি 'বিল্বমঙ্গল' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতির মত উপাদেয় নাটক দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ।

আর একটা কথা—সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান যে আমাদের ঘরেই আছে, তাহাও মনে হয়, রামনারায়ণই প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন বটে,—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গালাদেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি—আলালের ঘরের দুলাল।"—কিন্তু এই সঙ্গে রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকেরও নাম উল্লেখ করা বঙ্কিমবাবুর উচিত ছিল। যে বৎসর প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা' কাগজে তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক মুদ্রিত হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছিল। ইহার রচনা বোধ হয় আরও পূর্ব্বে হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন,—'যিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।' বলা বাহুল্য, এই দুইটি পুরস্কারই তর্করত্ন মহাশয় লাভ করেন।

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক যে সময় প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বাঙ্গালী সমাজে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। গিরিশ-চন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, ইহার এক অভিনয় রজনীতে নাকি জন-

কয়েক কুলীন ব্রাহ্মণ পৈতা ছিঁড়িয়া গ্রন্থকারকে অভিশাপ দিতে দিতে রঙ্গালয় হইতে প্রস্থান করেন।

সাহিত্য-সমাজেও এ বহির সে সময়ে আদর হইয়াছিল। রাজেন্দ্র-লালের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’ ইহার এক সুখ্যাতিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সে মাসিকপত্র এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য আমরা সেই সমালোচনার সার অংশটুকু এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—“প্রস্তাবিত নাটকখানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্য-রচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই।”... “বল্লালসেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, অভিনয়দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়-গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক-রচনা সর্ব্বদাই করিতেন। ‘ধূর্ত্ত নর্ত্তক’, ‘কৌতুকসর্ব্বস্ব’ প্রভৃতি রূপক সকল এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা একজন কবি রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্ম্মোৎসেদার্থে ‘হাস্যার্ণব’ নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে, তথাপি তাহা কুলীনকুলসর্ব্বস্বের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়। সাহিত্য-কারদিগের মতানুসারে একপ্রকার রচনার নাম ‘প্রহসন’। এবং তাহাতে দুই অঙ্কমাত্র থাকা উপযুক্ত। বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক-সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইতেছে না; বোধ হয়, বঙ্গ-

ভাষায় রূপকের প্রভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন। পরন্তু সে সন্দেহ পাঠকদিগের মনে বহুকাল স্থান পাইবার নহে; নটীর সুললিত গানে মোহিত হইয়া অবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। এতদ্দেশীয় কবিরা প্রায় বৃত্তচ্ছন্দেই কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, এবং মধ্যে মধ্যে নাগবিলাস, চম্পকলতা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যল্প লোকে পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ মাত্রাছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার 'স্বকণ্ঠ-নির্গলিত সুসঙ্গীতটি' পাঠমাত্রেই জয়দেবের ভুবন বিখ্যাত গীতগোবিন্দের স্মরণ হয়। আমাদিগের এ অভিপ্রায়ের সাক্ষীস্বরূপে উক্ত গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।—

"চূত মুকুলকুল, সঙ্কুলদলিকুল,
গুন গুন রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি নর্ত্তন, বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ-ঋতুরাজ-সমাজে।
নব নব কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে॥"...

"প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য নাই, কৌলীন্যমর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন এক অতি বৃদ্ধ কুলীন-পাত্রে আপন কন্যা-চতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য্য; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্য্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত্র অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যা কর্ত্তা কুলপালক

প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার বর্ণনা-পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনোমধ্যে অবিকল উদিত হয়; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি-বোধ হয় না। পরন্তু নাটকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রধান নায়ক তিনি নহেন, তদ্বিষয়ে অনৃতাচার্য্য চূড়ামণিই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। ঘটকের জাতীয় ধর্ম্ম-রক্ষার্থে তিনি সকল ঘটেই বর্ত্তমান। বোধ হয়, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনেক প্রযত্নে উহার চরিত্রের বিন্যাস করিয়া থাকিবেন; পরন্তু তৎপাঠানন্তর আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে স্বভা-বতঃ ধূর্ত্ত ঘটকের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি অনুভূত হইল না; কোন পরিচিত পদার্থের চিত্রপটের স্থানে স্থানে অসংলগ্ন বর্ণ বিন্যস্ত থাকিলে যদ্রূপ নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, ঘটকরাজের চরিত্রে তদ্রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।”...

“অতঃপর কন্যাপ্রসূ গর্ভবতীর দুঃখ, কন্যা-বিক্রয়ের দোষোদ্-ঘোষণ; ফলারের লক্ষণ, বিরহী পঞ্চাননের যাতনা, ও অভব্যচন্দ্রের পরিচয় প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে তর্কসিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যাপা-রের সুবর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু এ অল্পায়তন পত্রে তাহার আলো-চনা করায় নিরস্ত হইতে হইল; পরন্তু এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘কুলীনকুলসর্ব্বস্ব’ই রঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার যোগ্য; তাহার অভিনয় যাদৃশ মনোহর-বিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ্‌বিনোদ অধুনা বঙ্গভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না।”

যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, ‘কুলীনকুলসর্ব্বস্বে’র এই সমালোচনা হইতেই বাঙ্গলা বহির বাঙ্গলায় বড় করিয়া সমালোচনা লিখিবার রীতি আরম্ভ হয়। ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’ই এবিষয়ে প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একথাটিও স্থান পাইবার যোগ্য। আর এই সমালোচনা-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, ‘কুলীনকুলসর্ব্বস্ব’

সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বেশী কিছু নূতন কথা আজপর্য্যন্ত আর কোন সমালোচনায় প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। সমালোচনার আদিযুগে কোন এক সমালোচনার পক্ষে ইহাও একটা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

তারপর 'বেণীসংহার' নাটক। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র প্রায় এক বৎসর পরে রামনারায়ণের এই নাটকখানি প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত নাটকের এখানি প্রথম বঙ্গানুবাদ। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটীতে এই অনুবাদ-গ্রন্থের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। শুনিতে পাই, সেই প্রশংসায় উত্তেজিত হইয়া স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। তখন তাঁহার বয়স সতের বৎসরের বেশী হইবে না। গ্রন্থখানি 'বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটক' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বহি এখন পাওয়া যায় না।

'বেণীসংহার' চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,—"মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে বেণীসংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর-করুণ রসে পরিপূর্ণ ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য নাটকমধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।...কিন্তু সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রস-আস্বাদনে অসমর্থ; এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানবিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।"—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ 'বেণীসংহার'কে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই পুস্তকের সমালোচনা-কল্পে বলেন,—"কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয়

দুরূহ। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটককারের সে গুণের অভাব নাই। তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন। যদিও অনুবাদের স্থানে স্থানে মূলের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পরন্তু তাহাতে দোষা-রোপণ করা যায় না; কেন না, তিনি তাহা বিজ্ঞাপনে স্বীকার করিয়াছেন; বস্তুত নাটক অবিকল অনুবাদিত হইলে তাহার অভি-নয়ে অনুবাদকের মানস সিদ্ধ হইত না। ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে লিখিতেছি। সংস্কৃত বেণীসংহারের প্রথমাঙ্ক ভীমোক্ত একটি কবিতা দ্বারা শেষ হইয়াছে; ঐ শ্লোক যথা—

"অন্যোন্যাস্ফাল ভিন্ন দ্বিপরুধিরবসামাংসমস্তিষ্কপঙ্কে
মগ্নানাং স্যন্দনানামুপরিকৃত পদন্যাস বিক্রান্তপত্তৌ।
স্ফীতাসৃক্পানগোষ্ঠীরসদ শিব শিবা তূর্য্যনৃত্যৎ কবন্ধে
সংগ্রামৈকার্ণবান্তঃ পয়সি বিচরিতুং পণ্ডিতাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ॥"

অর্থ:—যুদ্ধস্বরূপ দুস্তর সাগর অতীব ভয়ানক; অস্ত্রক্ষত হস্তী-দিগের রুধির মেদ মাংস মজ্জা প্রভৃতি তাহার পঙ্ক। তাহাতে রথসকল নিমগ্ন রহিয়াছে; তদুপরি পদাতিক সৈন্যেরা ভীমনাদে আত্ম-পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে; এবং তচ্চতুর্দ্দিকে শোণিতপানে মত্ত শৃগালদিগের অমঙ্গল ধ্বনিতে কবন্ধসকল নৃত্য করিতেছে; পরন্তু এপ্রকার সমুদ্র পার হইতে পাণ্ডবেরাই সুপণ্ডিত; অতএব ভয় কি? আমরা এখনই চলিলাম।—অনুবাদক মহাশয় এই শ্লোকের অধিকাংশ ত্যাগকরতঃ 'যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাণ্ড-বেরা তাহা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই, আমরা চলিলাম' এই কথায় উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কি পর্য্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, পাঠকমহাশয়েরা অনায়াসেই অনু-ভব করিতে পারিবেন।" এ অনুবাদিত নাটক সম্বন্ধে ইহার চেয়ে আর বেশী কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না।

'বেণী-সংহার' প্রকাশের প্রায় এক বৎসরকাল পরে রামনারায়ণ 'রত্নাবলী' নাটকের বঙ্গানুবাদ বাহির করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এ গ্রন্থেরও একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সে সমালোচনার স্থলবিশেষ পাঠক-সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত। কারণ, সে অংশ টুকুতে যে জ্ঞাতব্য কথা আছে, তাহা এখনকার প্রায় সাড়ে-পনের আনা পাঠকের অবিদিত। সেটুকু এই,—"ইহার অনুবাদ প্রথমতঃ উইল্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় সুসিদ্ধ হয়। তদনন্তর ইহার উপাখ্যান-ভাগ শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যান করেন। উক্ত ব্যাখ্যান পাঠে আমরা কোনমতে সুতৃপ্ত হই নাই; এইপ্রযুক্ত শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পাঠ করিতে আমাদিগের বিশেষ স্পৃহা ছিল না। কোন বন্ধুর অনুরোধে পুস্তকখানি হস্তে লইয়া বৃথাশ্রমের ভয়ে বন্ধুর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু সে রোষ কেবল সৌদামিনীর ন্যায় উদিত হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রথমাঙ্ক না শেষ করিতেই লালিত্যরসে তাহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদনন্তর অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তর্করত্ন মহাশয় নাটক রচনায় সুপণ্ডিত, তাঁহার লেখনী সুরসপ্রসূ; তাহা হইতে যাহা কিছু নিসৃত হয় তাহাই রসোদ্দীপকভাব, সুচারুভঙ্গী, ও কোমলতম বাক্য বিন্যাসে অতীব মনোহর ঠাম ধারণ করে। তাঁহা কর্ত্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্পলোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গলায় রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে পণ্ডিত মহাশয় স্বীয়ানুবাদে সংস্কৃত পুস্তকের অনেক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং অপর অনেক স্থলে স্বকপোলকল্পিত বাক্যেরও প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন স্থানে সংস্কৃতের বিরুদ্ধভাব ব্যক্ত হয় নাই; বহুধাভাবের ঐক্য আছে, অথচ বাঙ্গালী প্রচলিত শ্লেষের প্রয়োগে রসের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। বোধ হয় দুই এক স্থানে সংস্কৃ-

তের অপনয়ন না করিলে রসের বিশেষ প্রাচুর্য্য হইত; পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা তর্করত্নের সহিত তর্ক করিব না। তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও বেণীসংহার পাঠ করত আমরা বিশেষ সন্তুপ্ত ছিলাম; অধুনা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মহামূল্য রত্নাবলীর লাভে আমরা নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছি।" এ পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও, রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইহাতে আসল কথা প্রায় সমস্তই বেশ গুছাইয়া বলা হইয়াছে। ইহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

'রত্নাবলী'র পর রামনারায়ণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক লিখেন। এখানিও রত্নাবলীর প্রায় এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এসময়ে মাইকেলের 'পদ্মাবতী' নাটকও বাজারে দেখা দিয়াছিল। এই দুইখানি নাটকই 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' একসঙ্গে সমালোচিত হয়। কিন্তু সে সমালোচনায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র তেমন প্রশংসা হয় নাই। সমালোচক লিখিয়াছিলেন,—"এতাদৃশ অনুপম পদার্থকে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করায় কোনমতে বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। কবিত্ব, বস্তু স্বভাব স্ফুটিকরণ ও সম্প্রসাদগুণ শকুন্তলার প্রধান সৌষ্ঠব, অভিনয়ে যদ্যপি তাহা না রক্ষা পায় তাহা হইলে শকুন্তলার অভিনয় না করাই শ্রেয়ঃ। পণ্ডিতমহাশয়েরা অনায়াসে অনেক উজ্জ্বল নাটক রচনা করিয়া অভিনয়ানুরাগিদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন; তন্নিমিত্ত শকুন্তলার কবিত্বের উৎসেদ, তাহার রসভাবাদির পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ, বা তাহাতে অন্যের রসভাবাদির আরোপণ, কোনমতে প্রশস্তকল্প মনে হয় না।...এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সর্ব্বতোভাবে সমাদরণীয় বটে।"

রামনারায়ণের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র পরে তাঁহার 'নব-নাটক' রচিত হয়। নাটকখানি ষষ্ঠাঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে সঙ্গীত আছে। গ্রন্থকার বহিখানি স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ

করেন। সে উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবৃত আছে। সে উৎসর্গ-পত্র এই—"মহাশয়, আমি আপনার এই অল্প বয়সে অনল্প দেশ-হিতৈষিতা, বদান্যতা এবং রসজ্ঞাদি গুণগ্রাম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই নব-নাটকস্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ। মুক্তাফল অনুত্তম বা কৃত্রিম হইলেও মহতের কণ্ঠে মূল্যবানের শোভা ধারণ করে। অতএব এই কুসুমমালা সুরভি-যুক্ত হউক বা না হউক এবং ইহার গ্রন্থনের পারিপাট্য থাকুক বা না থাকুক, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেই ইহার গৌরব সৌরভ প্রবৃদ্ধ হইতে পারিবে এবং আমারও পরিশ্রম সফল হইবে।"

'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র ন্যায় 'নব-নাটকে'রও উপাখ্যানাংশ সামান্য,—ইহাতে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে, 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' হাস্যরসপ্রধান, আর 'নব-নাটক' কিছু করুণরস-প্রধান। 'নব-নাটকে'ও হাস্যরস আছে; তবে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র চেয়ে কিছু কম। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে এই বহির এক অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে। তা'ছাড়া, এ পুস্তক সম্বন্ধে আর কোথাও কোন আলোচনাদি হইতে দেখি নাই। 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক সুপ্রাপ্য; সেই-জন্য সে সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করা উচিত মনে করিলাম না।

তারপর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, রামনারায়ণের 'মালতীমাধব' নাটক প্রকাশিত হয়। এখানিও তাঁহার 'বেণীসংহার,' 'রত্নাবলী' প্রভৃতির ন্যায় অনুবাদ-গ্রন্থ। ইহাতে যে কয়টি গান আছে, তাহা রাম-নারায়ণের রচিত নহে। বিজ্ঞাপনের একস্থলে গ্রন্থকার লিখিয়া-ছেন,—"নাটকের সঙ্গীত কয়টি শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন।" এ গ্রন্থ সম্বন্ধে এই বলিলে বোধ করি যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে যে, তর্করত্ন মহাশয় 'রত্নাবলী' ও 'বেণীসংহার' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে যে কৃতিত্ব দেখাইয়া-

ছিলেন, 'মালতীমাধবে'র অনুবাদেও তাঁহার সেই কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

'মালতীমাধবে'র পর তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, 'রুক্মিণীহরণ' নামক নাটক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের মলাটে লেখা আছে,—"স্বকপোলকল্পিত।" নাটকখানি পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত। 'মালতীমাধবে'র ন্যায় ইহাতে নান্দী প্রস্তাবনাদি কিছুই নাই। স্থলে স্থলে বেশ হাস্যরসের অবতারণা আছে। তর্করত্ন মহাশয় ইহাতে ধনদাস নামে যে একটি তোতলা দরিদ্র ব্রাহ্মণের চিত্র আঁকিয়াছেন, সেটি মন্দ হয় নাই। এ চরিত্রে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।

নাটকখানি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গ-পত্রে এই সংস্কৃত শ্লোকটি লেখা আছে,—

> "হাটক কর্ণাভরণং
> নাটকমিদং হি রুক্মিণীহরণাখ্যং।
> কুরুতাং কৃপয়াকর্ণে
> ভবদভ্যর্ণে সমর্পয়ামি ॥"

তারপর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ "স্বপ্নধন" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এখানি তাঁহার শেষ নাটক-রচনা। 'সিমুলিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমি' হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিতে পারিব না, কারণ ইহার সবটুকু পাই নাই,—ছিন্নাবস্থায় প্রথমাংশটুকু পাইয়াছিলাম মাত্র।

রামনারায়ণের নাটকসম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জানা ছিল, প্রকাশ করিলাম। শুনিতে পাই, উপরি-উক্ত নাটক কয়খানি ছাড়া, তিনি 'চেঙ্গিজ খাঁর জীবন-চরিত' ও অন্যান্য দুই-চারিখানি গদ্য-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সব গ্রন্থের সহিত আমাদের কখনও সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। অতএব রামনারায়ণের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিলাম। বারান্তরে অন্যান্য বঙ্গীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ছোট-গল্প

ছোট-গল্পটা পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। এমন লোক আছেন যাঁরা এই কথা শুনিয়াই নাক সিঁটকাইতে আরম্ভ করিবেন; এবং স্বদেশী সাহিত্যের চতুঃসীমানা হইতে এই বিদেশী রচনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া গঙ্গাজলের ছিটাসহযোগে কড়া পুরুতী পাহারায় নিযুক্ত হইবেন। বাংলা দেশে ছোট-গল্পের বয়স পঁচিশের উপর গিয়াছে। এ বিদেশী 'কলম' হইলেও বাংলাদেশে তার শিকড় বসিয়া গিয়াছে—এখন তার ফুলে ফলে ফলিয়া উঠিবার দিন আসিয়াছে। এখন Exotic বলিয়া গাল পাড়িলেও সে নড়িবার নামটি মাত্র করিবে না।

এই ধরণের লোকের হাতে সমাজের শাসন-দণ্ড থাকে সত্য—কিন্তু সেই শাসনদণ্ডকে না মানিয়া চলিবার মত শুভবুদ্ধিও সমাজের ভিতর হইতেই জাগিয়া উঠে। নির্ব্বিচারে টিকি ও পাকাচুলকে মানিবার দুর্ব্বলতা সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালেই স্বাভাবিক। সমাজ সেই দুর্ব্বলতার সময়ই টিকি ও পাকাচুলের হাতে শাসনদণ্ড চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, আবার জাগিয়া উঠিয়া তার বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টার উপর উদ্যত খড়্গের ন্যায় এই দণ্ডকে কাড়িয়াও লয়। এই জাগিবার ইতিহাস, এই কাড়িবার ইতিহাস বাংলায় রামমোহনে বিদ্যাসাগরে রবি-বঙ্কিমে কেশবে বিবেকে পাওয়া যায়। সুবিপুল নিদ্রিত সমাজ-দেহকে জাগাইবার জন্য এক এক যুগে এক একটা ব্যক্তির উদ্ভব হয়, এক একটা আর্কিমিদসের দণ্ড, কিন্তু তাই যথেষ্ট।

সকল ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্যের কাহিনীই এই ঘুম ও জাগরণের দুই-রঙা সূতার জালেই বুনা, এই সমাজ ও ব্যক্তি 'টাগ অব-ওয়ার' ছাড়া কিছুই নহে। আমাদের সাহিত্যের এই জাগরণের

দিনে বঙ্কিম বাংলার মাটিতে আধুনিক ছাঁচের উপন্যাসের পত্তন করিয়া গিয়াছেন, মাইকেল সনেট অমিত্রাক্ষর আমদানি করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল্প চালাইয়াছেন।

তালপত্র ও খাগের কলমের প্রতি আমাদের যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, আমাদের সাহিত্য যে সেখানে আর দাঁড়াইয়া নাই, সেখানে আর কোনোদিন ফিরিয়াও যাইবে না এবং যাওয়াও উচিত নয়—সেটা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। টিকি ও পাকাচুলের শাসন সম্পূর্ণ মানিয়া লইলে বাঙালী ছোট-গল্পের মুখ দেখিতে পারিত না, এই শাসনের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে চা-চিনি-গোলাপ-গোল-আলুর রসাস্বাদও তার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। এই শাসন মানিয়া লইলে ইটালির সনেট ইংলণ্ডে যাইত না, লুথার-কেল্‌ভিনের মতবাদ বিলাতে প্রচারিত হইতে পারিত না, ফরাশীরাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন গ্রীসে ইটালিতে ও আমেরিকায় জ্বলিয়া উঠিত না; প্রাচ্যের পরীগল্প পাশ্চাত্য কল্পনাকে চিরদিনের জন্য অনুরঞ্জিত করিয়া দিত না; আর প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান আরবমিশরের ভিতর দিয়া গ্রীসে গিয়া মুঞ্জরিত হইতেও পারিত না।

পণ্ডিতী কর্ত্তৃত্বের কবল হইতে বঙ্কিম ও মাইকেল বঙ্গসাহিত্যকে তার স্বাধীন পথে চালাইয়া দিয়াছেন—সেই পথে সে বিশ্বের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, রক্ত-মিশ্রণের ব্যাপার চলিতেছে। এই মিশ্রণের শুভ ফল সম্বন্ধে বিজ্ঞমহলে কোনো সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছোট-গল্পও নভেল সনেট অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি শুভফলের মধ্যে একটি।

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোট-গল্পই যে সবচেয়ে বেশী আধুনিক সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। প্রথমে পশু ও পরী-গল্প, তারপর রোমান্স, তারপর নভেল, সর্ব্বশেষে ছোট-গল্প।

পশু-গল্পগুলি ত ছোট, তবে সেগুলি ছোট-গল্প নয় কেন প্রশ্ন হইতে পারে। সাদাসিধাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতে

হয়—পশু-গল্পের নায়ক পশু, আর ছোট-গল্পের নায়ক মানব। কিন্তু পশু-গল্প-শাখার অন্তর্গত এমন অনেক গল্প আছে যেগুলি মানব ও পশু উভয়কেই অথবা শুধু মানবকে নায়করূপে লইয়াই রচিত হইয়াছে। তবে সেগুলি ছোট-গল্প নয় কেন? এর উত্তর দিতে গেলেই পশু-গল্প ও ছোট-গল্পের মধ্যে পার্থক্যের আভ্যন্তরীণ কারণের দিকে নজর করিতে হয়। তখন দেখিতে পাই সর্ব্ববিধ পশু-গল্পের মধ্যে নীতি-প্রচারই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে গল্প-কারগণ বাস্তব-অবাস্তব কিম্বা পশু-মানবের ভেদ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, নীতিপ্রচার এবং গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে পারিলেই শ্রোতা ও পাঠকগণের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ হইত। বর্ত্তমানের পাঠকগণ এত সরল নয়। নীতির উচ্চ মঞ্চে চড়িয়া কেউ তাদেরে শিক্ষা দিতে আসিবে এটা তাদের একেবারে অসহ্য। নীতিবিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটাই পূর্ব্বাহ্নে ধরিয়া লওয়া হয় বলিয়াই পাঠকগণ নীতির নামেই হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠেন। নীতিচেষ্টার মত বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের এত বড় বিপদ আর কিছুই নাই। কাজেই সাধারণতঃ আধুনিক কথাসাহিত্য হইতে নীতির ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত সযত্নে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। বহু দুঃসাহসিক নীতি প্রচার করিতে গিয়া সাহিত্যিক বিফলতার চোরা-গর্ত্তে পা ফেলিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ যে কলাকুশলার পল্লব-পুষ্পে এই নীতির কাঁটাকে ঢাকিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর সুপ্রাচীন বিগ্রহ-পন্থী (Symbolic) যুগের সহিত আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় রকমের পার্থক্যলক্ষণ এই নীতি ও উদ্দেশ্যমূলকতার অস্তিত্ব ও অভাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য আধুনিকতম সাহিত্যচেষ্টায় এই বিগ্রহপন্থা ক্লাসিক রচনার সংযমে বিধৃত হইয়া, কল্পপন্থার (Romanticism) কল্পনারাগে রঞ্জিত হইয়া, বস্তুপন্থার (Realism) বাস্তবচিত্রে বিচিত্র হইয়া, নূতন ছাঁচে আবার বৃত্তগতিতে দেখা

দিতেছে,—তার প্রকৃতিসম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এ নয়। তবে প্রাচীন বিগ্রহপন্থার মত ইহাতে নীতি ও উদ্দেশ্যমূলকতা প্রধান নয়।

আকৃতিতে ছোট প্রাচীন গল্পের সঙ্গে আধুনিক ছোট-গল্পের পার্থক্যের বিচার করিতে গেলে এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবাস্তব এবং অসম্ভব উপায়ে নীতিপ্রচার এবং শিক্ষাদান-চেষ্টাই প্রাচীন গল্পের লক্ষণ, আর গৃহসংসারের বস্তুচিত্র এবং মন ও হৃদয়লোকের কল্পচিত্রের সাহায্যে পাঠকগণকে আনন্দদানই হইয়াছে আধুনিক ছোট-গল্পের লক্ষণ। প্রাচীন পরী-গল্পের সাহিত্য-শিল্পও এই আনন্দদান-প্রচেষ্টার মধ্যেই সত্য, কিন্তু সেগুলি শুধু আমাদের অতিলৌকিক কল্পনাবৃত্তিকেই তৃপ্তিদান করে, এই সংসার-নাট্যের নিত্য প্রয়োজনের হৃদয় এবং মনোবৃত্তির চরিতার্থতা তাদের মধ্যে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

ছোট-গল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিসম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে তাদের সৃষ্টিরহস্যের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ছোট-গল্পের মত নভেল জিনিসটাও যে পাশ্চাত্যের সামগ্রী তা'তো নামেই প্রকাশ। আমাদের কাদম্বরী দশকুমার প্রভৃতি দু'-চারিটি উপাখ্যান আখ্যায়িকা সেই পদবীর দাবী করিতে পারে না। এই নভেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইউরোপে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলা যায়। তার পূর্ব্বে কথাসাহিত্য সোণার কাঠি রূপার কাঠি ও রাজকন্যার স্বপ্ন দেখিত, অবাস্তব অসম্ভব প্রেমব্যাপারে অনাবশ্যকরূপে উদ্বেল হইয়া উঠিত, বীরবৃন্দের পদভরে এবং প্রবল হুঙ্কারে মুহুর্মুহু স্পন্দিত কম্পিত হইত, দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনার অভিযানে বাহির হইয়া পড়িত; অথবা দিব্য আরামে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে রাখালের বাঁশীর মেঠো সুরের ভিতর দিয়া মনুষ্যলোকাবচ্ছিন্ন শৈলকান্তারপ্রান্তরে রাখালপ্রিয়ার কল্পনা-

সুখে মগ্ন থাকিত। মধ্যাব্দীয় যুগের আর্থার-সার্লিম্যানের বীরত্ব-কাহিনীর বহু পরেও ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগ পর্য্যন্ত এই গৃহ-সংসারাতিরিক্ত প্রেম-ব্যাপার, অত্যদ্ভুত বিপদাভিযান এবং রাখালী কাহিনী লইয়াই কথাসাহিত্যিক কারবার চলিয়া আসিয়াছে। এলিজা-বেথীয় যুগের কয়েকজন নাট্যকারকেও এই গদ্য রোমান্সের রচয়িতা-রূপে সাহিত্যের আসরে দেখিতে পাই।

তারপর অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী দিন চলিয়া গিয়াছে, তার মধ্যে কথাসাহিত্যিক চেষ্টার বিশেষ কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এলিজা-বেথীয় যুগের জাতীয় জাগরণের উচ্ছল শক্তিপুঞ্জের উচ্ছ্বাস তখন থিতাইয়া পড়িয়াছে। স্পেইনের মত কোনো বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে তখন আর জাতীয় উদ্বোধনের তেমন সুযোগ নাই। গৃহবিবাদ বিলাস এবং অতি-নীতি তখন জাতিকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে। মিল্টনের গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষ এবং নীতিনিষ্ঠা আর তার উল্টোটানে বিলাস-লীলাচারী কেরোলাইন কবিকুলের বস্তুরসসম্পৃক্ত কলকাকলির যুগে সাবেককালের রোমান্স আর বিশেষ আমল পাইল না; অথচ নভেল রচনার ধারা তখনো জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুকাল গেলে রবিন্সন-ক্রুশো-প্রণেতা ডেনি-য়েল ডিফো অনেকগুলি কথা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,—সেগুলি না রোমান্স, না নভেল। তবে সেগুলির বস্তুচিত্রের মধ্যে যে নভেলের বীজ ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত অ্যাডি-সন্ এবং ষ্টীলের সাময়িকপত্র স্পেক্টেটারের মধ্যেই খাঁটি নভেলের বীজলক্ষণ ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম প্রতিভাত হইয়া উঠে। স্পেক্টে-টারের অনেক চরিত্রচিত্রে এবং কল্পিত গল্পরচনাগুলিতে প্রাত্যহিক জীবনের যে খাঁটি বস্তুরস লাভ করা যায় তাহা তখন পর্য্যন্ত কোনো কথা-গ্রন্থে তেমনভাবে ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। অ্যাডিসন্ তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকৃত নভেলের এত উপাদান

বিচ্ছিন্নভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন যে কোনো নিপুণ মালাকর সেগুলি কাজে লাগাইয়া তুলিতে পারিতেন।

কার্য্যত অ্যাডিসন-শিষ্য ফরাশী মেরিভো অ্যাডিসনের রচনা-প্রেরণাতেই প্রথম নভেলের সূত্রপাত করেন। ছোট-গল্পের জন্ম ও পুষ্টিস্থান যেমন ফরাশীদেশ, প্রথম নভেলসৃষ্টির গৌরবও তেমনি তারই প্রাপ্য। জগতের সাহিত্যে মেরিভোই প্রথম প্রকৃত নভেল রচনা করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হয় না।

নভেল রচনা বিষয়ে ইংলণ্ডের রিচার্ডসন্ এই মেরিভোরই শিষ্য, যদিও এ বিষয়ে শিষ্যবিত্তাগরীয়সী এই কথা বলা চলে। রিচার্ড-সনের "ক্লেরিনা" ও "পেমেলা"র নিপুণ গৃহচিত্র, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, চিরপরিচিত মরাণো প্রেমের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যের ছবি, ইংলণ্ডীয় পাঠকসমাজকে এক অননুভূতপূর্ব্ব রসাস্বাদে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রিচার্ডসনের শক্তির দিক হইতে বিচার করিতে গেলে তাঁকে "নভেল রচয়িতাগণের পিতা" আখ্যা দেওয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়। রিচার্ডসনই নভেলকে ইউরোপীয় সাহিত্যে চালাইয়া দিয়া-ছেন। তার পর এপর্য্যন্ত কথাসাহিত্যে মোটের উপর নভেলের প্রাধান্যই চলিয়া আসিতেছে। স্কট ডুমা প্রভৃতি নিছক রোমান্স-রচয়িতাদের উপরও এই নভেলের প্রভাব যে একেবারে নাই তা' বলা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসর হইতে ইউরোপে নভে-লের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। তার প্রায় একশ' বৎসর পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরই ছোট-গল্পের আমল বলা যায়। এই সময়েই ফরাশীদেশে ডোডে, মেরিমি, গটিয়ে, ব্যাল্জ্যাক, মোঁপাসা ছোট-গল্পকে উচ্চসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য ভাষায় ছোট-গল্পের প্রভাব কিছুমাত্র কম না হইলেও সেগুলি লেখকের সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে ফরাশী ভাষার মত ঐশ্বর্য্যশালী নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য-

রস হিসাবে অন্ততঃ লুই ষ্টিভেন্‌সন্, সিকস্ত, জর্ণমন্, পো, ব্রেটহার্ট, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম করিতে হয়। ছোট-গল্পের দিকপালগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান একটি তুলনামূলক সমালোচনায় যিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন তিনি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের ধন্যবাদভাজন হইবেন। বর্ত্তমান লেখক এই প্রবন্ধে স্থানাভাবের অজুহাত দিয়াই এই সম্বন্ধে নিবৃত্ত থাকিতে চান; অবশ্য পাঠের অসম্পূর্ণতাটাই যে ভবিষ্যতেও তাঁকে নিবৃত্ত রাখিবে সেটা উহ্যই রহিয়া গেল।

নভেলের সঙ্গে ছোট-গল্পের একটা প্রকৃতিগত জৈব যোগ আছে, তার জন্যই নভেলের ইতিহাস নিয়া একটু আলোচনা করা গেল। নভেলরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহের ছোট ছোট শাখাপ্রশাখা লইয়াই এইজাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে বলা যায়। জগতের সাহিত্যে রোমান্স বহুদিন রাজত্ব করিয়াছে, কিন্তু নভেলের সৃষ্টি ও পুষ্টির পরবর্ত্তী সময় ছাড়া এই ছোট-গল্পের অভ্যুদয় অসম্ভব ছিল।

নভেলের সঙ্গে ছোট-গল্পের সম্বন্ধ দুই দিক দিয়া বিচার করা যাইতে পারে।

এক ধরণের ছোট-গল্পকে নভেলেরই অতি ছোট এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। নভেলের গৃহচিত্রাঙ্কন এই ধরণের ছোট-গল্পেও আছে, কিন্তু তাহা মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিত্র নয়। নভেলে চরিত্রগুলিকে যেমন মানবজীবনের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া বিচিত্র দিক হইতে তাদের বিশিষ্টতা তুলিকাসম্পাতে পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত করিয়া তুলা যায়, কিন্তু এই ধরণের ছোট গল্পে মানবচরিত্রের সমস্ত বিচিত্রতাকে চিত্রকরের পেন্সিলের দু'চারিটি রেখাপাতেই শুধু ছুঁইয়া যাইতে হয়, রঙ্ ফলানোর অবসর তাতে নাই।

এইরূপ ছোট-গল্পে নভেলের যা'কিছু সবই আছে, কিন্তু কিছুই

সম্পূর্ণভাব নাই। চারিদিকের রেখাটি আগাগোড়া ঠিক আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও বাদ যায় নাই; কিন্তু অনেকটা নিষ্প্রভ ও অস্ফুট হইয়া আসিয়াছে। তা-না-হলে গঠন-নৈপুণ্যের দিক হইতে নভেলে ও এই ধরণের ছোট-গল্পে কোনো পার্থক্য নাই। ঘটনাবৈচিত্র্য এবং সমাবেশের দিক দিয়াও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সম্পূর্ণতার দিক দিয়া তাদের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক্।

কিন্তু এ যেন নভেলকেই দূর হইতে দেখা। এই দূরের দেখায় সমগ্র শরীরগঠন এবং অংশগুলিও কতকটা ধরা পড়িলেও অঙ্গের অনির্ব্বচনীয় আভাটুকু ধরিবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্যবহুল সমগ্রের রস আস্বাদন করিবার দুর্ল্ভ স্পৃহা লইয়া এই ধরণের ছোট-গল্পের রাজ্য হইতে আমাদিগকে সাধারণতঃ নেহাৎ ব্যর্থমনোরথ হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হয়। লেখক এর মধ্যে কিছুই বাদ না দিবার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার কিছুই সম্পূর্ণভাবে রাখিবার অবসর পাইয়া উঠেন না। নভেলের বিচিত্র উপকরণ পরিবেশন করিতে গিয়া ভোগের ব্যাপারটাই এর মধ্যে বাদ পড়িয়া যায়; রসনাকে নেহাৎ নাসিকার উপর বরাৎ দিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। এর সবই অসম্পূর্ণ, কতকগুলি অস্পষ্ট আভাস লইয়াই তার কারবার, অথচ ব্যঞ্জনাপ্রধান বিগ্রহপন্থী রচনার শাণিত ইঙ্গিতের সঙ্গে এই মোটা ও ভোঁতা রচনাপদ্ধতির অক্ষম আভাসের কোনো যোগই নাই। এই গল্পলেখকেরা সাধারণতঃ নভেলের সৌন্দর্য্য-অংশকে ছাঁকিয়া রাখিয়া, নভেলের হাড় ক'খানা লইয়া দুর্ব্বলহৃদয় পাঠকের চোখে ভেল্কী লাগাইয়া দিতে চায়, মন্ত্র-পড়া জলের মন্ত্র-অংশকে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ জলের ফাঁকিতে ব্যারামীকে আরাম বিলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু চালচিত্তির ও মাটিরঙের লেপ সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া শুধু খড়ের মুর্ত্তির কাঠামো দিয়া পূজা পাওয়ার চেষ্টা সফল হইবার নহে। সাহিত্যরাজ্যে

নূতন স্থষ্টিরই গৌরব, তা' সে যেমনই হোক্,—নইলে পুরাতনের ছায়াকে লইয়া ছায়াবাজী খেলা, নভেলকে মারিয়া তার ভূতকে আনিয়া সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে নামানো কৃতিত্বের পরিচয় বহন করিয়া আনে না।

এই ধরণের গল্পকে ছোট-গল্প না বলিয়া ছোট নভেলই বলা যাইতে পারে। তবু আকৃতিতে সাদৃশ্যের ফাঁক দিয়া এই বর্ণ-চোরা রচনাগুলি কখন আসিয়া ছোট-গল্পের পংক্তিতে বসিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। এই বর্ণ-চোরা ছোট নভেল ছাড়া কতকগুলি প্রকাশ্য ছোট নভেল স্বনামেই পরিচিত আছে, আমি সেইগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। আর কলাকুশল লেখকের হাত এই বর্ণ-চোরা ছোট নভেলেও যে কোনো গুণপনা প্রকাশ করিতে পারে না এমনও নহে।

নভেলেরই একটি ছোট সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া নিলে ছোট-গল্পকে একটা স্বাধীন সাহিত্যস্থষ্টি বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত না, এবং তার নাম ছোট-গল্পও হইতে পারিত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছোট-গল্প যে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যরচনার স্থষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহ করা যায় না। ছোট-গল্পের এই স্বাতন্ত্র্য কোন্ জায়গায় তা আমাদের বিচার করিয়া দেখার বিষয়।

কাব্যসাহিত্যকে আমরা মহাকাব্য খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। গেটে Epic Dramatic Lyricএ কাব্যের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তার মধ্যে নাটককে খণ্ডকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যায়। খাঁটি সাহিত্যে কাব্যসাহিত্যের পরই কথাসাহিত্যের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই দুই বিভাগেই মানব-মনের কল্পনা এবং মানব-হৃদয়ের অনুভাবগুলি (Passions) লইয়া সাহিত্যিক কারবার চালাইতে হয়। মানব-মনের চিন্তাশক্তিকে এখানে কতকটা অপ্রধানভাবেই কাজ করিতে হয়, তার আপন ক্ষেত্র হইয়াছে সন্দর্ভসাহিত্যে। ভিতর-

কার প্রকৃতিলক্ষণে কাব্যসাহিত্যে ও কথাসাহিত্যে যেমন একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে, বাহিরের শ্রেণীবিভাগেও যে তেমন একটা সাদৃশ্য নাই তা বলা যায় না। কথাসাহিত্যের রোমান্স, নভেল ও ছোট-গল্প কাব্যসাহিত্যের তিন বিভাগেরই অনুরূপ। পদ্য মহাকাব্যে যেমন, গদ্য রোমান্সেও তেমনি, সবই অতিরিক্ত এবং অতিপ্রাকৃত; দুই জায়গায়ই দেবতা অথবা দৈত্য পরী ও অতিমানবদেরই লীলাখেলা। তারপর ধীরে ধীরে মানবসাহিত্যের কল্পলোকের এই উচ্চ সুরটি খণ্ডকাব্যে ও নভেলে মানবসংসারের নিম্ন খাদে নামিয়া আসিল, চড়া কল্পনার বর্ণচ্ছটা প্রস্ফুট দিবালোকের মত শুভ্র হইয়া আসিল। মহাকাব্যে ও রোমান্সে বিচিত্র বর্ণরাগের ফাঁকে ফাঁকে মানব-সম্বন্ধের যে শুভ্র আলোক-রেখাটি লুকাইয়া ছিল, খণ্ডকাব্য ও নভেল-রচয়িতারা সেটাকেই ধরিয়া বসিলেন এবং সেটাকেই মনের তা দিয়া এই জগৎজোড়া দিবালোকে পরিণত করিয়া তুলিলেন। মহাকাব্যে ও রোমান্সে যা সরল এবং রেখামাত্রে লীন ছিল, নাটকে-নভেলে তাই পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া উঠিল। মহাকাব্যের বিশেষত্বহীন সরল শকুন্তলা-কাহিনী কালিদাসের মনে সৃষ্টির আনন্দ জমাইয়া তুলিল; যা' অংশমাত্র ছিল সেখান হইতে তা' সম্পূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আসিল, মহাকাব্যের একটা ছিন্ন অঙ্গ কালিদাসের জীবনোত্তাপময়ী তুলিকা-লেখায় একটি স্বতন্ত্র অঙ্গীতে পরিণত হইয়া উঠিল।

মানবীয় সাহিত্যচেষ্টা কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইলেও পরস্পর পরস্পরের সহিত অনুবদ্ধ, একই শৃঙ্খলে গাঁথা। মহাকাব্যে খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে এই যে সূক্ষ্ম ও গোপন যোগসূত্রের রহস্য তাহা ধরিতে না পারিয়াই কত অর্ব্বাচীন কত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিকে অনুকরণ বলিয়া কলঙ্কের ছাপে দাগিয়া দিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছে।

মহাকাব্যের এক একটি সরল ঘটনার বিবৃতি নাট্যকবির হৃদয়-

মনে কেমন করিয়া সৃষ্টির প্রেরণা আনিয়া উপস্থিত করে, কি করিয়া নাট্যকাব্যে আসিয়া তাহা শাখাপ্রশাখায় বিচিত্র হইয়া উঠে, বহুবিচিত্র বিরোধী অংশের আশ্চর্য্য সমাবেশ-নিপুণতায় তাহা কেমন শক্তিশালী ও হৃদয়স্পর্শী হয়, অভিনব রসস্ফূর্ত্তি এবং অর্থদ্যোতিতে তাহা কেমন স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির গৌরবলাভ করে সে রহস্য সাহিত্য-রসিকদের নিকট অবিদিত নাই। ইস্‌কাইলাস্ কোনও কোনও বিষয়ে হোমরের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, কালিদাস ভবভূতি ব্যাস বাল্মীকির নিকট কোনও কোনও বিষয়ে ঋণী থাকিতে পারেন, কিন্তু সে শুধু তাঁদের কবিত্ব-স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুটরূপে বিঘোষিত করিবার জন্যই।

জগতের মহাকাব্য আর মহাকাব্যের টুক্‌রা পুরাণকাহিনীগুলি যেমন অগণিত খণ্ডকাব্যের সম্ভাবনাকে গর্ভে ধরিয়া বসিয়া আছে, রোমান্সগুলি নভেল সম্বন্ধে ঠিক তেমন না হোক্, অন্ততঃ নভেলের আভাসবীজ যে তাদের অংশবিশেষে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

মহাকাব্যের সঙ্গে খণ্ডকাব্যের সম্বন্ধ যেমন, খণ্ডকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের সম্বন্ধ তদনুরূপই। শ্রেষ্ঠ খণ্ডকাব্যের এখানে সেখানে এমন অনেক ইঙ্গিত লুক্কায়িত থাকে যাহা গীতিকবিদের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে। কালিদাসের "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাণি নিসম্য" শ্লোকটিকে কোনো গীতিকবি তাঁর নিজস্ব কল্পনায় অনুরঞ্জিত করিয়া, তাঁর স্বানুভূতির রসে ভিয়ান দিয়া একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত করিয়া দিতে পারেন। মহাকাব্যে যেমন খণ্ডকাব্যের বীজ আছে, খণ্ডকাব্যেও তেমনি অসংখ্য গীতিকবিতার বীজ নিহিত আছে। মহাকাব্যের অংশবিশেষকে যেমন নাট্যকবির মনের অণুবীক্ষণ দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়া নাটকে পরিণত করিয়া তুলা যায়, খণ্ডকাব্যেরও তেমনি কোনো বিশেষ অস্পষ্ট বাক্য বা অনুভূতিকে গীতিকবির হৃদয় ও কল্পনারাগে রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল করিয়া, অস্ফুট কিম্বা

অনতিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া, সাধারণের মধ্যে বিশেষের রং ফলাইয়া গীতিকবিতা করিয়া তুলা যায়।

এই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্যের সম্বন্ধের কথাটি মনে রাখিলেই নভেল ও ছোট-গল্পের সম্বন্ধ লইয়া এবং ছোট-গল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদিগকে আর গোলে পড়িতে হইবে না। তখন জানিব খাঁটি ছোট-গল্প নভেলের একটি ছোট সংস্করণ নয়, পরন্তু তার অংশবিশেষ-দ্বারা অনুপ্রাণিত গীতিকাব্যের মতই একটা নূতন সাহিত্যসৃষ্টি।

গীতিকাব্য ও ছোট-গল্পের মধ্যে যে একটা সাদৃশ্য আছে তা স্বীকার করিতে হয়। মানব-হৃদয়ের বাস্তব অনুভূতি লইয়া রচিত হইলেও, গীতিকবিতার মত ছোট-গল্পেও এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তা থাকে যা নাকি পার্থিব স্থূলতা হইতে তাকে একটু উপরে তুলিয়া রাখে, একটা অতৃপ্তির সুর যা নাকি জড়-জিনিসের প্রকৃতির বহি-র্ভূত, একটা অস্ফুট আত্মার ক্রন্দন, একটা "desire of the moth for the star" যা নিখিল প্রয়োজনীয়তার কূল ছাপাইয়া উপছিয়া পড়ে। রিক্টার নাকি গান শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-তেন—"Away! Away! thou speakest to me of things which in all my endless life I have not found, and shall not find." অনেক ছোট-গল্প সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে কবিরা সর্ব্বত্র ভাষার উৎকর্ষ ও কারু-শিল্প সমান ভাবে বজায় রাখিতে পারেন না, এই দীর্ঘ ক্ষেত্র ব্যাপিয়া খুব ক্ষমতাশালী কবিরও শ্রান্তি ধরে এবং লেখনী ঘন ঘন এলাইয়া পড়ে। মহাকাব্য প্রভৃতির কবিরা বহুবিচিত্র রঙের ফুলের ডালি আমাদের সাম্‌নে তুলিয়া ধরেন বলিয়াই সেই পাঁচ ফুলের সাজির মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় ভাষার ফুলটি বাদ পড়িল কি না তাহা দেখিবার অবসর মুগ্ধ পাঠকের ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু স্বল্পপরিসর গীতিকবিতায় অন্তবিধ নানা উপায়ে স্তেক্ষী

লাগাইয়া ভাষার ফাঁকি দিবার সুযোগ কিছুমাত্র নাই। গীতিকবিতার প্রত্যেকটি কথা ওজন করা, প্রত্যেকটি শব্দ কুঁদিয়া কুঁদিয়া তৈরি, তার কোথাও এতটুকুমাত্র খুঁত নাই। শ্রেষ্ঠ লিরিকগুলি যেন এক একটি হীরক-কণা, বাদ-সাদ দিবার কিম্বা ফেলা-ছড়ার মতন তাতে কোথাও কিছু নাই। বড় বড় কাব্যগুলি যেন প্রকাণ্ড এক একটা কাঠের ফ্রেম, তার এখানে-সেখানে দু'চারিটা হীরার টুক্‌রা বসানো থাকিতে পারে এই মাত্র। সাহিত্য-সমজদারেরা গীতিকাব্যকেই এইজন্য শিল্প-হিসাবে সব চেয়ে পরিণত বলিয়া মনে করেন, এবং গীতিকাব্যোচিত কলানৈপুণ্যকেই সমস্ত সাহিত্যরচনার একমাত্র ধ্রুবলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, এবং সেই আদর্শেই অন্যবিধ সাহিত্যসৃষ্টিরও উৎকর্ষের বিচার করিয়া থাকেন।

গীতিকবির যেমন, ছোট-গল্প রচয়িতারও তেমনি, ভাষাটি উভয়ের হাতে একটি শ্রেষ্ঠ শাণিত অস্ত্র হওয়া চাই। রোমান্সে এবং নভেলে প্রত্যেক বাক্য এবং শব্দের শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য করার তেমন দরকার এবং ক্ষমতার সুযোগ নাই। ঘটনার পাছে ঘোড়দৌড়ে সেখানে ভাব ও ভাষা হয় অনাবশ্যক লাঙ্গুলরূপেই সব সময় পিছনেই থাকিয়া যায়, নতুবা ঘটনার পাথরের চাপে একরূপ উহুই হইয়া পড়ে। গদ্যপদ্যের একটা স্বাভাবিক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে গীতিকবিতার মত ছোট-গল্পের ভাষাটিও কলাকুশলতার চূড়ান্ত নিদর্শন হওয়া চাই, বাক্যের ভঙ্গী ও শব্দের প্রয়োগ এমনি নিপুণ এবং সুষ্ঠু হওয়া চাই যে কোনো দ্বিতীয় লেখকের হাতে ভাষা যেন কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সহিতে না পারে। লিরিকে ও ছোট-গল্পে ভাষা পরিবর্ত্তনসহ নহে, তার মানেই হইয়াছে এই যে সেই দুই জায়গায় ভাষায় ভাবে এমনি মাখামাখি যে এই ভাবসম্বন্ধে অনধিকারী অপর কাহারো এই ভাবের দেহ-স্বরূপ ভাষার উপর ছুরিকা চালাইয়া অন্য অঙ্গ জুড়িয়া দিবার চেষ্টায় রক্তারক্তি ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

গীতিকাব্যের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইয়াছে তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরটি। কবি এখানে তাঁর নিজের মনোভাব লইয়াই কারবার করেন, এবং পাঠকের মনে আপনার স্বমূর্ত্তিতেই আসিয়া হাজির হন। পরন্তু নাট্যকবি আপনাকে চিরকাল যবনিকার আড়ালে রাখিয়া জগতের দশজনকে নানা মূর্ত্তিতে দর্শকের বিস্ময় দৃষ্টির সম্মুখে ছাড়িয়া দেন। আরো একটু সত্য করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, নাট্যকবি আপনাকেই হাজারো টুক্‌রায় ভাঙ্গিয়া, আপনারই বিচিত্র মনোবৃত্তিগুলিকে বিভিন্ন বেশে সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে পাঠাইয়া দেন এবং জগতের বৈচিত্র্যের একটা তীব্রোজ্জ্বল মাদকতার স্বাদ লাভ করেন; আর গীতিকবি আপনার স্বরূপটি কিছুমাত্র না ভাঙিয়া আপনাকে অখণ্ডরূপে ধরা দেন এবং আত্মার একক-রসের গোধূলি-ঘেরা করুণ-কোমল মাধুর্য্যটি নিবিড়ভাবে উপভোগ করেন। জলের উপর জগৎ-জোড়া আলোর খেলায় আপনাকে সহস্রদলে ছড়াইয়া দিয়া আপন স্বরূপটিকে লুপ্ত করিয়া দেওয়াই হইয়াছে নাট্যকবির লক্ষণ, আর মনের গহনতলে আপনার মৃণালরূপী স্বরূপে ধ্যানতন্ময় হইয়া থাকাই হইয়াছে গীতিকবির লক্ষণ। নট-কবি রাম শ্যাম হরিতে আপনাকে ভাঙাইয়া দেন বলিয়াই তাঁর কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না, গীতিকবিতে সেই ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

গীতিকাব্যে যেমন, ঠিক তেমন না হোক্, এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরটি যে রোমান্স ও নভেল অপেক্ষা ছোট-গল্পেই বেশী পরিস্ফুট তাহা নিঃসন্দেহ। ছোট-গল্পে বিভিন্ন চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ নাই। অনেক সময় লেখক সেখানে একটিমাত্র চরিত্রকে বিশেষ করিয়া ফুটাইতে গিয়া 'আমি'কেই নায়কের পদে বসাইয়া দিতে আরামবোধ করেন, অথবা রামু-শ্যামুকে সেই পদে আরূঢ় করিলেও 'আমি'র সঙ্গে তাদের ব্যবধানটা অনেক সময়ই শুধু একটা পাত্‌লা পর্দ্দার, তা'ও কোথাকার কোন্ দম্‌কা বাতাসে কখন্ কোথায় উড়িয়া যায় তার ঠিকঠিকানা নাই

আর গীতিকবিতার মত খাঁটি ছোট-গল্পও একটিমাত্র রস বা অনুভূতি লইয়াই ফুটিয়া উঠে। তার মধ্যে বিরোধী ভাবের সংঘাত নাই, বৈচিত্র্যের তীব্র আস্বাদ নাই, বিভিন্নমুখী স্রোতধারার জটিল পাকচক্র নাই,—আছে শুধু একটি সরল অনাবিল স্রোতের রেখা, গীতিকবিতার মত একটি সূক্ষ্ম অনন্তপ্রসারী আলোকশিখা যা বস্তু-লোক ও কল্পলোকের মাঝে একটি আলোর সুকুমার সেতুর মত বিস্তারিত হইয়া পড়িয়া আছে, যা নাকি অন্ত হইতে অনন্তের দিকে রহস্যপ্রয়াণে তার চরম পরিণামরূপে এক পরম একের চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ছোট-গল্প জাগতিক বৈচিত্র্যের খোলামাঠ নহে, গীতিকবিতারই মত তা অনেকটা মনোগহনের নিবিড় রহস্যদুর্গ। সেখানে অনুভূতির চাবি লইয়া না আসিলে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিতে হয়। সেখানে ঠকা মানে একবারে চরম ঠকা, লাভ মানে পরিপূর্ণ লাভ। দশটা পাঁচটা জিনিস আছে, মনের সঙ্গে মিলাইয়া যাচাই করিয়া কিছু ঘরে আনিব, কিছু ফেলিয়া আসিব, সে বাচ-বিচার করিবার অবসর সেখানে নাই।

খাঁটি ছোট-গল্প খাঁটি গীতিকবিতার ন্যায় একটিমাত্র অনুভূতি লইয়া সরল রেখার মত ফুটিয়া উঠে সত্য। কিন্তু গীতিকাব্যের সাধারণ সংজ্ঞার মধ্যে যেমন গান, গাথা, ওড, সনেট, আইডিল আর ব্রাউনিং সেলি ষ্টিফেন ফিলিপ্স্ ও রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীতিকা এবং নাট্যকাব্যগুলিও অন্তর্গত, সেইরূপ ছোট-গল্পের মধ্যেও বহু বিচিত্র রকমের রচনা স্থান পাইয়াছে। তার অনেকগুলি খাঁটি ছোট-গল্প না হইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট যে নয় এমন কথা বলা যায় না। ধরুন রবীন্দ্রনাথের "পোষ্টমাষ্টার" গল্পটি, ইহা একটি খাঁটি ছোট-গল্প, ঠিক যেন একটি করুণ-সুরের গদ্য-গানের মত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "দিদি" কিম্বা "সমাপ্তি" সেই শ্রেণীভুক্ত নহে। এগুলি-তেও একটা মূল সুর আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা ডালপালাতে বেশ

একটু বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এদের একটা নাটকীয় গঠন আছে, অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতিগুলি বেশ তাজা তাজা কতকগুলি বাস্তব ঘটনার মধ্যে তাদের আশ্রয় খুঁজিয়া নিয়াছে, অন্তর-প্রাচীরের মধ্যেই সেগুলি গুমরিয়া গুমরিয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করে নাই।

খাঁটি ছোট-গল্পের অনির্ব্বচনীয় রসটুকু নাটকীয় ছোট-গল্পে নাই; তার যে একটা "divine discontent," একটা অজানা অতৃপ্তির সুর সেটা এখানে আসিয়া বাস্তব ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া কোথায় হারাইয়া যায়; এই যে ঘরছাড়া জগৎ-সংসারের অতীত একটা ভাব সেটা ঘরের এবং জগৎ-সংসারের বস্তু-বেষ্টনের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া তার চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলে, যাহা রহস্যময় তাহা দিবালোকের মত প্রকাশ্য হইয়া উঠে, অনির্ব্বচনীয় স্থূল নির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে, আর সেই অজানা করুণ-সুরের রঙীন সূক্ষ্ম অশ্রু-বাষ্প বাস্তব দুঃখের অশ্রুজলে জমিয়া আসে;—এ যেন কল্পলোকী অকাজটিকে এই নাটকীয় ছোট-গল্পে মাটির পৃথিবীর কাজে ভাঙা-ইয়া লওয়া হয়।

নাটকীয় ছোট-গল্পও খাঁটি ছোট-গল্পকে গাল পাড়িয়া একথা বলিতে পারে যে দু'চার জনের মনের আবছায়ার এই নিরবলম্ব অনুভূতিটা শুধু দিবালোকের কর্ম্মের আশ্রয়ের অভাবেই ভূতের মত তাদের বুক চাপিয়া রহিয়াছে এবং একটা কল্পিত অনির্ব্বচনীয়তার রস যোগাইয়া এই নিষ্কর্ম্মা দুর্ব্বল ব্যক্তিদের অসুস্থ কল্পনাকে একটা অলীক আনন্দ দিতেছে;—দু'চারটা ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু খাঁটি ছোট-গল্পের এই যে অনন্তপ্রসারী একানুভূতির সন্ন্যাসীগিরিটা সেটা সাধারণত কৌপীনকম্বলের বুজরুকি ছাড়া কিছু নহে,—তার চেয়ে ঘরসংসারে থাকিয়া দশজনের কাজে লাগিয়া যাওয়া ঢের ভাল।

বিচিত্র রকম ছোট-গল্প থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে

তার প্রকৃতিটা যে সরল এবং গীতিকাব্যেরই মত একানুভূতিপ্রধান সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এর ভালমন্দ দুইই আছে। কেহ কেহ বলেন, এবং আমাদের মনের একদিকও তাতে সায় দিয়া থাকে যে, গীতিকবিতা আর ছোট-গল্প জগতের ছবি নহে, মনেরই ছবি—এটাই তাদের দোষ। তখন “কলিকা”র সরু লাঠি ও মোটা লাঠির ঝগড়ার কথাটা বলিয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হয়। যে আমরা এখন ছোট-গল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেই আমরাই আবার অন্য সময় তাদেরে নেহাৎ খেলো এবং চুট্‌কী বলিয়া চট্‌ করিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসি। কোনো কোনো সময় আমরাই মনে করি আমাদের হৃদয়-মনের সর্ব্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষা এই স্বল্পপরিসর রচনাগুলিতে তৃপ্ত হয় না; ইহারা কেবল তরল নৃত্যলীলায় হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া বহিয়া যায়, কোনো চিরস্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় না; জটিল জীবন-সমস্যার আলোচনা এগুলিতে নাই, সামাজিক কূটপ্রশ্নের মীমাংসা নাই; মানব-মনের সঞ্চিত জ্ঞানবিজ্ঞানের মানস রস এসব রচনায় হৃদয়-লোককে আসিয়া তোলপাড় করিয়া তুলে নাই, এদের হৃদয়-রসকে বিরোধের সংঘাতে বিচিত্র এবং গভীর করিয়া দেয় নাই, হাল্কা এবং কোমল হৃদয়-রসকে মেরুদণ্ডের মত বিধৃত করিয়া রাখে নাই।

আমরাই আবার অন্য সময় তার পাণ্টা জবাব লইয়া হাজির হই এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিই যে এসব রচনাতে জীবন সমাজ জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই আছে, কিন্তু কিছুই তার আদিম অশোধিত স্থূল অবস্থায় নাই, সমস্তই কল্পনার উত্তাপে গলিয়া গিয়া এক সূক্ষ্ম সুকুমার জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে প্রকৃত সমজদারের নিকট শুধু

“গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলাম এঁকে”

বলিয়াই অভিব্যক্তি এবং জন্মান্তরবাদের সমস্ত তত্ত্ব নিঃশেষে বন্ধ হইয়া যায়, যদিও অনধিকারীর কাছে এইরূপ ব্যঞ্জনাপ্রধান জরাট বাক্যগুলি ফাঁকা কবিকল্পনা বৈ কিছু নহে।

অন্যান্য বৃহদায়তন সাহিত্য রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া কোনো কোনো সময় গীতিকবিতার মত ছোট-গল্পকে গাল দিতে গিয়া বলি—ইহা যেন একটি ঋজুরেখা, যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই, যা নাকি অসম্ভবরূপে খাড়া এবং এক-রোখা হইয়া দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু নাটক-নভেলের মত বৃত্তাকারে এই জগৎসংসার বেড়িয়া নাই; অর্থাৎ যার মধ্যে জগৎসংসারের সম্পূর্ণতা এবং গোলকত্বের সম্পূর্ণ অভাব আছে, যা অংশ এবং খণ্ড রচনা মাত্র।

এর উত্তর দিবার সময় বিপরীত যুক্তিটাও হাতের নাগালেই পাই। তখন বলি—চোখের দেখাটা সত্য নয়, সত্যজ্ঞানে সরল রেখার অস্তিত্ব জগতে অসম্ভব, যা নাকি চোখের দেখায় আমরা ঋজু বলিয়া মনে করি তা আমাদের নয়নের অগোচর এক সুবৃহৎ বৃত্তের অংশ বৈ কিছু নহে। যাদের অন্তরের চক্ষু খুলিয়াছে তারা সেই অংশের মাঝেই সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে দেখিতে পায়। আর এই অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে দেখাই আধুনিক যুগের সাধনা। প্রতি-পদের ক্ষীণ চন্দ্রকলার গায় যেমন পূর্ণিমার চাঁদের অস্পষ্ট ছায়া-ভাসটি লাগিয়া আছে, সেইরূপ জগৎসংসারের সমস্ত খণ্ড জিনিস জুড়িয়া তার অখণ্ড স্বরূপটি অস্পষ্টভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ তার অনন্ত সম্পূর্ণতার সম্ভাব্যতাকে গর্ভে লইয়া তার সহৃদয় কবি এবং দর্শকের হৃদয়ের স্পর্শের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, বসিয়া আছে "for its destined human deliverer" তার মানব-পরিত্রাতার আশায়। প্রাচীন কবিদের যে অনন্তবোধ লাভ করিবার জন্য অষ্টাদশপর্ব্ব এবং সপ্তকাণ্ড ব্যাপিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ঘুরিয়া আসিতে হইত, আধুনিক কবিদের সেইজন্য শুধু

গিরিগাত্রস্থিত একটি ক্ষুদ্র "প্রিমরোজে"র উপর অল্পকালের জন্ম অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই চলে, কারণ ক্ষুদ্র 'প্রিমরোজে'র মধ্যেই সেই অনন্ত ধরা দিয়াছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে সাধকদের সিদ্ধির জন্য কত "ভজন পূজন সাধন আরাধনা" করিতে হইত, কলির সাধকদের অতি অল্পেতেই শুধু হরির নাম নিলেই নাকি সেই সিদ্ধিলাভ হয়, প্রাচীন পন্থীরা এটুকু স্বীকার করিয়াও কলির গালে চূণকালি দিতে ছাড়েন না। কিন্তু এই চূণকালিতে কলির কাল-গৌরব ঢাকিবার নহে।

আদিম স্থূল মনোবৃত্তিগুলি লইয়া প্রাচীন কবিদের কারবার ছিল, প্রকাশও তাই তাদের স্থূল রকমের,—মহাকাব্যে। সূক্ষ্ম সুকুমার প্রত্যক্ষের অগোচর কতকগুলি মনোবৃত্তি লইয়াই আধুনিক কবির কারবার, প্রকাশের ভঙ্গীও তাই তাদের সূক্ষ্ম,—লিরিকে কিম্বা ছোট-গল্পে। ছোটর ভিতর দিয়া বড়কে দেখাই আধুনিকদের সাধনা। এই হইয়াছে আধুনিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ লিরিক—ছোট-গল্পের প্রকৃতি-লক্ষণ। আধুনিক লেখকেরা তাই মহাযুদ্ধ, রাজ্য-ভাঙাগড় এবং দেবতা-অবতারের লীলার কাহিনী ছাড়িয়া নিভৃত পল্লীর ক্ষুদ্র এবং উপেক্ষিত তরু লতা ফুল ফল ও পথঘাট এবং জীবন-রহস্যকে সাহিত্যের আলোকে উদ্‌ঘাটিত এবং মনোরম করিয়া তুলিতে-ছেন, কারণ তাঁরা জানেন

"ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নহে,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রহে!"

আধুনিকেরা জানেন "Joys in widest commonalty spread", —আনন্দ এই মাটির পৃথিবীর এখানে-সেখানেই ছড়াইয়া আছে। তার জন্য স্বর্গ নরক তোলপাড় করিয়া তুলিতে হয় না।

অংশের ভিতর সম্পূর্ণতাকে দেখা, ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া বৃহতের অনুসন্ধান, সীমার মাঝে অসীমের সুর শুনিতে পাওয়া, এটাই কলির

কাল-গৌরব। জানি তার্কিকেরা প্রাচীন উক্তির কালি ছিটাইয়া কলির গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিবে, কিন্তু সমগ্রকালের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান লইয়া বিচার করিলে এই গৌরব যে বিশেষ করিয়া কলিরই প্রাপ্য সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, যে কলিতে মানবের মন নানা বিরোধে নানা বৈচিত্র্যে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিচিত্র ধর্ম্মমতের মিশ্রণে মতিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, নানা সমাজের সংঘাতে তুলাধুনা হইবার যোগাড় হইয়াছে, যে কলিতে জীবনসংগ্রাম অত্যুগ্র, জাতি-সমস্যা জটিল, অস্ত্রের লড়াইয়ে এবং অন্নবস্ত্রের কাড়াকাড়িতে প্রতি দেশের রক্তাক্ত অথবা কঙ্কালসার হইবার আশঙ্কা পদে পদে, যখন কবির পক্ষে তাঁর মনোরাজ্যের দুর্গম পথে যাত্রীর জন্য সুদীর্ঘ সাধনা অসম্ভব, যখন তাঁকে সমাজচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, অন্নের কাঙাল হইয়া ঘুরিতে হয়, অর্থ ও রাজনীতির স্বর্ণমৃগের পাছে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে হয়। এই যে কলির বিচিত্র কলকারখানা ও কর্ম্মচেষ্টা তারা কবির মনের উপরও তাদের অধিকার বসাইয়াছে। কবির মনকে এখন সব-কিছুকেই স্পর্শ করিয়া যাইতে হয় বলিয়াই কোনো কিছুকেই দীর্ঘকাল আঁকড়িয়া থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই যে অংশোপজীবিতা, এটা কলিরই লক্ষণ, কবিও সেই কালপ্রভাবের বহির্ভূত নহেন। এখন তাঁকে স্বল্পক্ষণেই স্বল্পকথায় দুই একটা ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই সাহিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া দিতে হয়। এইখানেই আমরা আধুনিক স্বল্পপরিসর সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ খুঁজিয়া পাই।

কিন্তু এই যে স্বল্প তা যদি অমৃতের কণা না হয় তবে তাতে কি পেট ভরিতে পারে, না মানবসমাজের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? এই যে সমস্তকেই ছুঁইয়া যাওয়া এযদি কিছুকেই তলাইয়া দেখা না হয় তাহা হইলে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চঞ্চলভাবে নাচিয়া বেড়ানোটাই যে আধুনিকদের জীবন-কথা হইয়া পড়ে।

তারা কি শুধু বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্র বিশেষ? তাদের জীবনের কি কোথাও মূল নাই, একটা স্থিতি নাই? শিকড়ের মত যে নিবিড় অন্তঃপ্রবেশ সমস্ত সমাজতরুকে ধারণ করিয়া রাখে, তারই যদি অভাব হইয়া পড়িল, তাহা হইলে তার মত সুবিপুল নিষ্ফলতা, তার মত প্রকাণ্ড ব্যর্থতা আর কি হইতে পারে! চুট্‌কীর চঞ্চলতা কলির প্রধান দোষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকালে বড় বড় আধ্যাত্মিক কথার ফাঁকা আওয়াজ যে কম দোষের ছিল তাহা ত বলিতে পারি না, একাল পর্য্যন্ত না পৌঁছিলেও যে আওয়াজের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লওয়াটা মোটেই কষ্টকল্পনা নহে। কিন্তু মূঢ় সাধারণের সেই ফাঁকা আওয়াজের জন্য যেমন প্রাচীনকে নিন্দা করা যায় না, তেমনি অক্ষমদের স্বল্পজলের সফরিচাঞ্চল্য দিয়াও নবীনকে গাল দিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনতার কাজ। পরন্তু এই চুট্‌কী ও চটুলের ভিতর দিয়াই যাঁরা গভীরের সাধনা করিয়াছেন, তাঁদের কার্য্যপরম্পরা দিয়াই কলির কাল-লক্ষণ নিরূপণ করিতে হয়। আধুনিক সমাজে অনন্তের রস টানিয়া আনিতে পারেন এমন লোক অনেক আছেন বলিয়াই আধুনিক সমাজ টিকিয়া আছে, নইলে এতদিনে সে ঝরিয়া শুকাইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই অনন্তের রসটানার পদ্ধতি নিয়াই সত্যে আর কলিতে যা কিছু তফাৎ। স্বল্পে সিদ্ধি, ছুঁইয়া যাইতে যাইতেই সমস্তকে জলের মত তলাইয়া দেখা, শুধু ধর্ম্মজগতে কেন, ইহাই কলির সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার মূল প্রকৃতি লক্ষণ।

আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বাহির হইতে আধুনিক স্বল্পপরিসর রচনার ক্ষুদ্র চেহারা এবং সূক্ষ্ম অপ্রধান একটি হৃদয়-ভাবের খেলা দেখিয়াই এগুলিতে ক্ষুদ্রত্বের এবং অসম্পূর্ণতার দোষ আরোপ করা যায় না। বাহিরের দিকে এদের সঙ্কোচ, কিন্তু অন্তরের দিকে এদেরই অসীম বিস্তার। একটিমাত্র সূক্ষ্ম হৃদয়-ভাব কবির নিবিড় অনুভূতিতে এমনি প্রগাঢ়তা লাভ করে যে, মনোগহনের

মূল পর্য্যন্ত তাহা আবেগ-কম্পন সঞ্চারিত করিয়া দেয়, যে মূল হইতে সমস্ত বহির্বৈচিত্র্যের বিকাশ, যাহা নাকি সমস্ত সম্পূর্ণতার একমাত্র আবাসভূমি। হৃদয়ের একটিমাত্র সূক্ষ্ম স্পন্দন-তরঙ্গ হৃদয় হইতে হৃদয়ে, যুগ হইতে যুগে প্রসারিত হইয়া অসীমের দিকে ছড়াইয়া পড়ে, যে অসীম হইতে সমস্ত সীমার প্রকাশ, যাহা নাকি সমস্ত অংশের একমাত্র মিলন-লোক।

যাহা হউক আমাদের মনের এ দু'টা দিকের কোনোটাই অসত্য নহে। গীতিকবিতার মত ছোট-গল্পও একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টি, তার ভাল যেমন তার মন্দও তেমনি তার নিজস্ব প্রকৃতিকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলে। কিন্তু সাহিত্যসভায় গীতিকবিতার মত উচ্চাসন ছোট-গল্প লাভ করিয়াছে একথা বলা যায় না, গন্তপাল্ডের আপেক্ষিক সম্মানের কথা ভাবিলে কোনোদিন লাভ করিবে তা'ও মনে হয় না। কিন্তু গীতিকবির সম্মান খণ্ডকাব্যের কবির সম্মানের চেয়ে কিছুমাত্র কম নহে, বরং আধুনিক যুগে ঢের বেশী। কিন্তু আধুনিক যুগেও নভেল রচয়িতাদের পাশে ছোট-গল্প লেখকেরা নেহাৎ হীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ছোট গল্প সর্ব্ববিধ সাহিত্যচেষ্টার মধ্যে সব চেয়ে বেশী অর্ব্বাচীন, সাহিত্যসংসারের মৌরশী পাট্টা এখনো সে পায় নাই, কিন্তু পাওয়ার যে উপযুক্ততা তার আছে, রসিকজনের সভায় সেই সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

আঁধার

আঁধার, আঁধার, তবু যে আঁধার রহে!
যে আলোক চাহি তাহা এ নয় গো নহে।
সুনিবিড় নিশীথিনী সীমাহীন কালো—
তার মাঝে তুমি তারা গ্রহ শশী জ্বালো;
ঘরে ঘরে জ্বলে কত বাতি কত আলো!
—গাঁথি আলোকের মালা হাতে প্রদীপের থালা
ভাষাহীন বিভাবরী লয় কি তোমারে রবি?—
মোরা বলি যত কাজ যা ছিল ফুরালো,
শীতল আঁধারতলে অঙ্গ জুড়ালো;
(মোরা বলি এই ভাল!)
বাহিরে বাতাস উছসি কাঁদিয়া কহে—
আঁধার, আঁধার!—যা চাহি এ নহে নহে!

দিবসের আলো—স্বর্ণরথে সে আসে,
তরুণ হাসিতে কি যে মায়া পরকাশে!
ভুবনের 'পরে ফেলে অরুণ চরণ—
ধরণীর কালো বাস করিয়া হরণ
পরায় তাহার গায়ে হিরণ পরণ!
—সে আলোতে হয় হারা রজনীর শশী তারা;
সে আলো দেখায় যত ঢাকে সে যে আরো তত—
সে আলো শ্রান্তিভরে মলিন বরণ
ম্লান গগনেতে লভে ক্লান্ত মরণ।
(তার এ কিবা ধরণ!)
সাঁঝের মাঝেতে উদাস পরাণ কহে—
আঁধার, আঁধার! তবু যে আঁধার রহে!

শ্রী——

বোল-বোলা হৃদয়

[এড্‌গার অ্যালেন্ পো'র "দি টেল্-টেল হার্ট" অবলম্বনে]

সত্যি! দুর্ব্বল, অত্যন্ত, অত্যন্ত, আমি ভয়ানক দুর্ব্বল ছিলাম ও আছি, কিন্তু তুমি কেন তাতে বল্‌বে যে আমি পাগল হ'য়েছি? রোগ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আরো খরধার করে তুলেছে, তাদের নষ্ট করে নি, তাদের ভোঁতা করে নি। সকলের উপরে, নিখুঁত-ভাবে শোনার শক্তি আমার অতি তীক্ষ্ণ ছিল। আকাশ ও ধরায় আমি অনেক জিনিস শুনেছিলাম। নরকেরও আমি অনেক শুনেছি। তবে আমি পাগল কি করে? শোন! ভাল করে দেখ, কেমন সুস্থ ভাবে, কেমন ধীরে, সমস্ত কাহিনীটা আমি বল্‌তে পারি।

প্রথমে কি করে যে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে ও-ভাবটা প্রবেশ করলে, সেটা বলা অসম্ভব, কিন্তু একবার মাথায় গজিয়ে উঠ্‌তেই, তা আমায় অহোরাত্র ভূতে-পাওয়ার মত করে তুলেছিল। কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল না। কোন রস তার মধ্যে ছিল না। আমি সে বুড়া মানুষটাকে ভালবাস্‌তাম। সে কখন আমার কোন ক্ষতি করে নি। সে কখন আমার কোন রকমের অপমান করে নি। তার স্বর্ণ-মুদ্রার জন্য আমার কোন তৃষাই ছিল না। আমার মনে হয়, শুধু তার ওই চোখ! হাঁ, সেই তাই! তার একটা চোখ ঠিক গৃধিনার মত দেখ্‌তে—ফ্যাকাসে নীল চোখ, তায় যেন একখানা কাঁচ ঢাকা। যখনই তার তাকানি আমার উপর পড়্‌ত, আমার সমস্ত রক্ত জল হ'য়ে যেত, এম্‌নি করে দাগে দাগে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, আমি ওই বুড়ার জীবননাশের জন্য মনকে ঠিক করে ফেল্‌লাম! এইবার চিরতরে ওই চোখ থেকে নিজেকে মুক্ত করে লব।

এখন এইটাই হচ্চে আসল কথা। তুমি ভাব্‌ছ আমি উন্মাদ।

পাগলেরা ত কিছুই জানে না। তোমার আমাকে দেখা উচিত ছিল। তোমার দেখা উচিত ছিল কি রকম বিজ্ঞের মত আমি অগ্রসর হয়েছিলাম—কি রকম সতর্কতার সঙ্গে—কি রকম দূরদৃষ্টি—কি রকম নির্ম্মম হ'য়ে, আমি কার্য্যে অগ্রসর হয়েছিলাম। তাকে যখন হত্যা করি, তার পূর্ব্বে সমস্ত সপ্তাহের ভিতরে আমি বুড়ার উপর আর কখন অত স্নেহ মায়া ঢালি নি। এবং প্রতিনিশি দ্বিপ্রহরে তার ঘরের দ্বারের চাবিটা ঘুরিয়ে দরজা খুল্‌তাম—ওঃ কি সন্তর্পণে! আর তারপর আমার মাথাটা গলাবার মতন ফাঁক করেই একটা আঁধারে লণ্ঠন সব বন্ধ করে ধর্‌তাম—এমন করে বন্ধ কর্‌তাম যাতে কোন রকমেই আলো প্রকাশ হ'তে পার্‌ত না, আর তারপরে আমি মাথাটা ভিতরে প্রবেশ করাতাম। কি রকম চালাকী খেলিয়ে আমি মাথাটা গলাতাম, তা দেখ্‌লে তুমি ত হেসেই মর্‌তে। ধীরে ধীরে আমি সেটা সরাতাম; অত্যন্ত, অত্যন্ত ধীরে, যাতে ওই বুড়ার ঘুমের না ব্যাঘাত হয়। আমার সমস্ত মাথাটা সেই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করাতে আমার একটা পুরো ঘণ্টা লাগ্‌ত, এতটা পর্য্যন্ত, যাতে আমি দেখ্‌তে পারি কেমন করে সে তার শয্যার উপরে শয়ন করে আছে। হা হা! একটা পাগল কখন এমন বুদ্ধিমান হতে পারে? তার পরে যখন আমার মাথাটা বেশ পরিষ্কার ভাবে ঘরের মধ্যে ঠিক হয়ে থাকে, তখন আমি লণ্ঠনের ঢাকা খুব সাবধানে খুলি—ওঃ এমন সাবধানে—সাবধানে (কারণ দরজার কব্জাগুলো ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠ্‌তে পারে) লণ্ঠনের ঢাকাটা এতটুকু খুলতাম, যাতে শুধু একটা ক্ষীণ রেখার মত আলো তার ওই গৃধিনী-চোখের উপর পড়ে। আর এই রকম সাতটা গভীর দীর্ঘ নিশা আমি এই করেছি, প্রতি নিশায় ঠিক দ্বিপ্রহরে, কিন্তু সব সময়ই আমি দেখি তার চোখ মুদে রয়েছে—আর তাইতে আমার পক্ষে সে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত—কেননা ওই বুড়াটা ত আর আমায় জ্বালায় নি, কিন্তু ওই, ওই তার পাপ আঁখি। আর প্রতি প্রভাতে যেই ভোর হো'ত,

আমি নির্ভয়ে তার ঘরের মধ্যে যেতাম, এবং খুব সাহসের সঙ্গে তার সঙ্গে কথা কইতাম, খুব বুকভরা স্নেহের সুরে তার নাম ধরে ডাকতাম, আর জিজ্ঞাসা কর্‌তাম রাত্‌টা তার কেমন কাট্‌ল। তবে এখন ত তুমি বুঝতে পাচ্ছ যে সে একজন খুব বিজ্ঞ গোছের বৃদ্ধ লোক হ'তে পার্‌ত, সত্য সত্যই, যদি আমি যে, সে যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন, ঠিক রাত বারোটার সময়, তার দিকে তাকিয়ে থাকি এটা একটুও সন্দেহ কর্‌ত।

অষ্টম রাত্রিতে, দ্বার খুলবার সময় আমি অন্য সময়ের অপেক্ষা আরো বেশী সতর্ক হয়েছিলাম। আমার হাত পা নড়ার চেয়ে ঘড়ীর মিনিটের কাঁটাও দ্রুত সরে। সে রাত্রির পূর্ব্বে আর কখন আমি আমার বিচক্ষণতা ও আমার ক্ষমতার প্রসার বোধ কর্‌তে পারি নি। আমার জয়ের ভাবকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখ্‌তে পারছিলাম না—আমি যে একটু একটু করে দ্বার খুলছি, আর আমার সেই গোপন কাজ বা ভাব, সেটা যে স্বপ্নেও বুড়া এঁকে নিতে পাচ্ছে না, এই ভেবে। আমি সে ভাবটাকে বেশ করে উপভোগ করে মনে মনে ভারি হাসলাম। হয় ত সে আমার হাসি শুন্‌তে পেলে, কারণ, সে যেন অকস্মাৎ চম্‌কে ত্রস্তে বিছানার উপর ধড়মড় করে নড়ে উঠ্‌ল। এখন তুমি হয় ত মনে কর্‌তে পার যে আমি পেছপাও হলুম, কিন্তু না—তা নয়। গাঢ় আঁধারে তার ঘর কাল পীচের মত অন্ধকার ছিল (কারণ ডাকাতের ভয়ে তার ঘরের সব জানালা খুব ভালকরে বন্ধ করা থাক্‌ত) তাইতে আমি জান্‌তাম যে সে দরজা খোলা দেখ্‌তে পাচ্ছে না—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সোজা হ'য়ে দরজা ঠেল্‌তে লাগ্‌লাম।

আমার মাথাটা ঘরের ভিতর নিয়েই যেমন আমি লণ্ঠনের ঢাকা খুল্‌তে গেছি, অমনি আমার বুড়ো আঙ্গুলের মাথাটা টিনের ঢাক্‌নির উপর থেকে পিছলে গেল, আর বুড়োটা বিছানায় লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"কেরে ওখানে?"

আমি চুপ করে স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম—রা বার করি নি। এক ঘণ্টা ধরে আমি আমার একটা পেশীও নড়াই নি—আর তাকে শুয়ে পড়্তেও শুনি নি। সে তখনও পর্য্যস্ত বিছানায় বসে শুন্‌তে লাগ্‌ল; ঠিক আমি যেমন নিশার পর নিশা ভিত্তিগাত্রে মৃত্যুর ইঙ্গিতপানে কান খাড়া করে থাক্‌তাম্।

একটা যেন গ্যাঙানির শব্দ শুন্‌লাম—আমি জানি সেটা মৃত্যুভয়ের গ্যাঙানি। এ বেদনার বা দুঃখের যাতনার শব্দ নয়—ওঃ, না! এ সেই আত্মা যখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে, তার বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা দম-আটকান শব্দ যেমন ওঠে। ও শব্দটা আমি খুব ভাল জান্‌তুম। অনেক রাত্রি, ঠিক রাত দুপুরে, যখন সারা জগৎ সুপ্তিতে মগ্ন, আমার নিজের বুকের ভিতর থেকে ডুক্‌রে ছাপিয়ে উঠ্‌ত, যে ভয় আমাকে দিশেহারা করত, তাকে সেই ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিতে ডুবিয়ে দিত। আমি বল্‌ছি আমি খুব ভাল জানি। আমি জান্‌তুম ও বুড়ার মনে তখন কি হচ্ছিল, যদিও আমি সেটা প্রাণভরে মনে মনে হাস্‌ছিলাম, আমার তবুও একটু মায়া হচ্ছিল। আমি জান্‌তুম যে প্রথম সেই একটু শব্দ হতেই যখন সে নড়ে উঠেছে, তখন হতেই সে জেগে শুয়ে আছে। তখন থেকেই তার ভয় আরো উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। সে কিন্তু সেগুলোকে অকারণ বলে মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু পার্‌ছিল না। সে আপনাআপনি বল্‌ছিল, "কিছু না ওই চিম্‌নিতে বাতাস ডেকে গেল, ও শুধু একটা ইঁদুর ঘরের ভেতর লাফিয়ে গেল" অথবা "ও শুধু একটা উচ্চিংড়ে কীরর্‌ করে উঠেছে।" হ্যাঁ, এই সব মনগড়া ধরে নিয়ে সে মনটা শান্ত কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু দেখ্‌লে বৃথা সব। সবই বৃথা, মৃত্যু তার কাছে আসবার সময়, তার আঁধার ছায়া নিয়ে, পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে তার সম্মুখে এসেছে, তাকে তিমিরে জড়িয়ে ফেলেছে। তারি সেই অদৃশ্য ছায়ার করাল প্রভাবই তার প্রাণে ওই ভাবগুলো জাগিয়ে দিয়েছিল,

নইলে সে ত দেখ্‌তেও পায় নি, শুন্‌তেও পায় নি, তবু ঘরের ভিতর যে আমার মাথাটা আছে তা সে বোধ কর্‌তে পেরেছিল।

অনেকক্ষণ ধরে আমি খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম। তার শয়ন করার শব্দ পেলাম না। তখন আমি লণ্ঠনের ফাঁক একটুখানি খুল্‌তে মনস্থ কর্‌লাম,—একটুখানি খুব একটুখানি। তার-পর খুল্‌লাম,—কি রকম ধীরে নিঃশব্দে তুমি তা সে ভাব্‌তেই পার না—ঠিক যেন লূতার জালের একগাছি সূতার মত অস্পষ্ট আলোর রেখা লণ্ঠনের ফাঁক হ'তে শেষ বের হল—আর তার সেই গৃধিনী-চক্ষুর উপর পড়্‌ল।

সেটা যেন বিস্ফারিত—ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে তাকিয়ে রয়েছে, যতই আমি তা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, ততই আমি আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লুম। প্রত্যেক রেখায় রেখায় তাকে দেখলাম—সমস্তটাই ফ্যাকাসে নীল, তার উপর একটা ঘোর-করা যবনিকা ফেলা—আমার অস্থির মজ্জা পর্য্যন্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। তা ছাড়া কিন্তু আমি সে বুড়ার মুখখানা বা শরীরটা কিছুই দেখ্‌তে পাই নি, কারণ ঠিক সেই অভিশপ্ত স্থানটার উপর যে আমি আলোর ধারা ফেল্‌তে পেরেছিলাম, সে যে আমার স্বভাবধর্ম্মে।

এখন' আমি তোমায় বলি নি কি, যে তুমি যেটা পাগলাম বলে ভুল কর্‌ছ, সেটা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতি-প্রখরতা? এখন আমি বল্‌ছি যেন আমার কানে একটা চাপা, অস্পষ্ট ও দ্রুত শব্দ এল, ঠিক যেমন একটা ঘড়ী তুলা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আওয়াজ হয়। আমি সে শব্দটাকেও খুব ভাল জান্‌তাম। ওটা সেই বুড়ার বুকের স্পন্দন শব্দ। দামামার ঘোর রোল যেমন সৈনিকের বুকে সাহসকে জাগিয়ে তুলে, তেমনি ওই শব্দ আমার বুকের অগ্নিকে ভীষণ করে জাগিয়ে তুল্‌লে।

কিন্তু আমি তখন পর্য্যন্ত নিজেকে দমন করে স্থির হ'য়েছিলাম। আমার দম বন্ধ হ'য়ে ক্বচিৎ নিশ্বাস পড়্‌ছিল। অচল হ'য়ে লণ্ঠনটা

ধরে ছিলাম। যেই চোখটার উপর কি রকম সোজাভাবে সেই আলোর রেখাটা ধরে রাখ্‌তে পারি তারি চেষ্টা কর্‌ছিলুম, এর মধ্যে তার বুকে নরকের ধুক্‌-পুকুনির টক্‌টক্‌ শব্দ বেড়ে উঠ্‌ল। প্রতি পলে অতি দ্রুত ও জোরে জোরে হ'তে লাগ্‌ল। বুড়োর আশঙ্কা নিশ্চয় অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌ছিল। জোরে, জোরে, আমি বল্‌ছি, প্রতি নিমিষেই সজোরে—তুমি আমার কথাটা বেশ ভাল করে লক্ষ্য কর্‌ছ ত? আমি তোমায় বল্‌ছি যে আমি দুর্ব্বল ছিলাম ও এখন তাই। এখন এই সূচীভেদ্য অন্ধ তিমিরে, আর এই পুরাণো বাড়ীর ভয়াবহ নিস্তব্ধতার মাঝে ওই অপরিচিত শব্দে আমার যে অদম্য ভয়ের উত্তেজনায় জাগিয়ে দিলে। তবুও আমি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেমে ছিলাম, কিন্তু জোরে, জোরে, তাল পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি ভেবেছিলাম বুঝি হৃদয়টা দীর্ণ হয়ে গেল। এখন তারপর আর একটা কথা, একটা নূতন ভাবনা আমায় জড়িয়ে ধর্‌লে,—শব্দটা ত পাড়ার লোকেও শুন্‌তে পেতে পারে। বুড়ার সময় হয়ে এসেছে। আর একটা বিকট গর্জ্জনে লণ্ঠনের আবরণটা উন্মুক্ত করে ফেল্‌লাম এবং লাফিয়ে ঘরের মধ্যে পড়লাম। সে শুধু একবার চীৎকার করে উঠ্‌ল,—শুধু একবার! চক্ষের নিমিষেই আমি তাকে মেজেতে টেনে সেই ভারি বিছানাটা তার উপর চাপা দিলাম। তারপর একটু প্রাণখুলে হেসে নিলাম, দেখলাম কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একটা জড়ান জড়ান শব্দের সঙ্গে বুকটা ধপ্‌ ধপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তা সে আমায় বেশী জ্বালায় নি—সে ত আর দেয়াল ফুঁড়ে শোনা যাবে না। তারপর সেটা থাম্‌ল। বুড়া তখন মরে গেছে। বিছানাটা সরিয়ে লাসটা পরীক্ষা করে দেখলুম। হাঁা, ঠিক পাথর। পাথরের মত মৃত। বুকের উপর আমার হাতটা কিছুক্ষণ ধরে রেখে দেখলাম। সেখানে কোন স্পন্দন নেই। সে কাল পাথরেরই মত মৃত। আর তার চক্ষু আমাকে জ্বালাবে না।

যদি এখন তুমি আমার উন্মাদ মনে কর, তাহ'লে কি রকম তীব্রতা ও সতর্কতা নিয়ে সেই মৃত দেহটাকে লুকালাম, তার বর্ণনাটা শুন্‌লেই, তুমি আর তা কখন ভাব্‌তে পার্‌বে না। রাত্রি বয়ে গেল, আর আমিও নিঃশব্দে ত্বরিতে সে কাজ সারলুম।

ঘরের মেজের তিনখানা তক্তা সরিয়ে সমস্তই সেই ভাঙ্গাচুরা কাঠগুলোর ভিতরে রেখে দিলাম। তারপর এমন চতুরতার সঙ্গে, সেই তক্তাগুলা ফের্ বসালাম, যে কোন মানব-চক্ষু—এমনকি "তার"—কোন রকমে যদি ভুল ধর্‌তে পারে। কিছু ধৌত কর-বার ছিল না—কোন রকমের কোন দাগ ছিল না—কোথাও কোন রক্তচিহ্ন ছিল না। সে সব বিষয়ে আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলুম।

যখন সব কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল—তখন চারটা বেজে গেছে—তখনও পর্য্যন্ত দুপুর-রাতের মত ঘন অন্ধকারে ঢাকা। যেই ঘড়ীর ঘণ্টা বেজে গেল, অমনি সদর দরজায় কে আঘাত কর্‌লে। খুব সহজ ও হালকা বুকে আমি দ্বার খুলে দেবার জন্য নেমে গেলাম—এখন আর আমার কিসের ভয়? তিনজন লোকে প্রবেশ কর্‌লে, খুব স্বচ্ছন্দ ভাবে তারা পরিচয় দিলে যে, তারা ফাঁড়ীর লোক। রাত্রে একজন পড়সী একটা ভয়ানক চীৎকার শুনেছে—কোন বদমাইশীর খেলা হয়েছে বলে সন্দেহে ফাঁড়ীতে খবর দেয়—তাই তারা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছে।

আমি খুব হাসছিলুম—কেন কিসের জন্য আর আমি ভয় পাব? ভদ্রলোকদের বল্‌লাম 'স্বাগতম্'। চীৎকারটা আমি বল্-লাম, আমারই, আমিই স্বপ্নে চীৎকার করে উঠেছিলাম। বল্‌লাম যে বৃদ্ধ পল্লীগ্রামে গেছেন, এখানে নেই। আমি দর্শকদের বাড়ীর সব স্থান দেখালাম। আমি বল্‌লাম, আপনারা অনুসন্ধান করুন, খুব ভাল করে অনুসন্ধান করুন। আমি শেষে, তাদের তারই ঘরে নিয়ে গেলাম। তাদের বুড়ার সমস্ত ধনরত্ন দেখালাম, সবই

রয়েছে। একটুও নড়চড় হয় নি। আমার বিশ্বাসের উপর অতি-ধারণায় আমি তাদের জন্য ঘরে কেদারা এনে দিলুম—বল্লুম, এইখানে আপনারা বসুন, বড় ক্লান্ত হয়েছেন, বিশ্রামলাভ করুন। আর আমি নিজে আমার সম্পূর্ণ বিজয়ের উদ্দাম দুঃসাহসে, যেখানে আমার শিকারের মৃত দেহটা ঢাকা ছিল, আমার নিজের আসন ঠিক তারই উপরে নিলাম।

কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট হোল। আমার ব্যবহার তাদের বিশ্বাস এনে দিলে। আমি বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করলাম। তারা বসল, নানা বিষয়ে কথা কইতে লাগ্‌ল, আর আমি প্রফুল্ল হয়ে উত্তর করতে লাগলাম। কিন্তু তার বহু পূর্ব্বেই আমি যেন কেমন পাণ্ডাশ-পানা হতে লাগলুম—আমার কেবলই ইচ্ছা হচ্ছিল যে তারা চলে যায়। আমার মাথা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগ্‌ল। কানে যেন কি ভোঁ ভোঁ করতে লাগ্‌ল, কিন্তু তারা বসে রইল আর ওই রকম গল্‌ গল্‌ করে কথা কইতে লাগ্‌ল। ভোঁ ভোঁ শব্দটা আরো পরিস্ফুট হ'তে লাগ্‌ল—ক্রমাগতই হ'তে লাগ্‌ল, আরো বেশী পরিষ্কার শোনা গেল। ওই ভাবটা দূর করবার জন্য আমি আরো অসঙ্কোচে কথা কইতে লাগ্‌লাম—কিন্তু ও শব্দ চল্‌ল আর ক্রমশঃ খুব পরিষ্কার ভাবে তার স্বরূপ প্রকাশ করলে—তারপর আমি বুঝলাম, দেখলাম,—যে শব্দটা আমার কানের ভিতরেই নয়।

নিঃসন্দেহ, আমি এখন অত্যন্ত বিকৃত পাণ্ডাশ-পানা হ'য়ে উঠলুম—কিন্তু আমি আরো তাড়াতাড়ি কথা কইতে লাগ্‌লাম—আর গলার স্বর খুব উচ্চ সুরে চড়িয়ে। তবুও শব্দটা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—আর আমি কি করতে পারি? একটা চাপা অস্ফুট ও দ্রুত শব্দ, ঘড়ীটা তূলার মধ্যে জড়িয়ে রাখ্‌লে যেমন শব্দ হয়, ঠিক্ তেম্‌নি। আমি নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ ক'রে হাঁফিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম কিন্তু তবু কর্ম্মচারীরা তা শুনতে পেলে না। আমি আরো তাড়াতাড়ি কথা কইতে লাগ্‌লাম—খুব সজোরে, কিন্তু সে শব্দ দৃঢ়

ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। আমি উঠে দাঁড়ালুম, ভয়ানক হাতমুখ নেড়ে খুব উচ্চ সুরে, সামান্য কথা নিয়ে তর্ক করতে লাগ্‌লাম ;—কিন্তু সে শব্দ কেবলই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কেন তারা এখন চলে যায় না? মানুষগুলোর রকমসকম দেখে রাগে জ্বলে গিয়ে, আমি জোরে জোরে পা ফেলে ঘরের এধার ওধার করে বেড়াতে লাগ্‌লুম কিন্তু সে শব্দ দৃঢ় ভাবেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ওঃ, ভগবান! আমি কি করব? আমি ফোঁস করে উঠলুম, গর্জ্জন করে উঠ্‌লুম,—শপথ করলুম। যে কেদারাখানায় আমি বসে ছিলাম, সেটাকে ঘুরিয়ে ফেলে, দুলিয়ে তক্তার উপর তাকে ঠুক্‌তে লাগ্‌লুম, কিন্তু সে শব্দ সব ছাড়িয়ে জোর করে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—ক্রমশই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। জোরে—জোরে—সজোরে—সে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। আর তবু সেই, সেই লোকগুলো হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর গল্‌গল্‌ করে কথা কইতে লাগ্‌ল। এটা কি সম্ভব যে তারা তা শুন্‌তে পায় নি? সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান!—না—না! তারা শুনেছিল—তারা সন্দেহ করে-ছিল।—তারা জান্‌ত।— তারা আমার ওই ভীতিকে ছলে উপহাস করছিল। তাই আমি ভেবেছিলাম, তাই আমি ভাব্‌ছি। কিন্তু এ যাতনার চেয়ে অন্য যে কোন কিছুও ভাল ছিল। এই ঘৃণার হাসির চেয়ে অন্য আর যে কোন কিছুও সহনীয়। তাদের সেই ছলভরা কাষ্ঠহাসি আর আমি সহ্য করতে পার্‌ছিলুম না। আমার বোধ হ'ল যে আমি খুব জোরে চীৎকার করি আর না হ'লে মরে যাব—এবং এখন—ওই, আবার! শোন! জোরে, জোরে,—সজোরে!—

"পাষণ্ডদল!" আমি চীৎকার করে উঠলুম—আর আমার সঙ্গে ছলনা করিস নি। আমি কাজ স্বীকার করছি।—উপ্‌ড়ে ফেল এই তক্তাগুলা!—এইখানে, এইখানে! তার সেই বিকৃত বীভৎস বুকের ধ্বনি!

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

বাতুলের গান

(১)

খাম্বাজ—আদ্ধা কাওয়ালী।

বাদল ঝুম ঝুম বোলে
না জানি কি বলে!
বুঝিতে পারি না কথা
তবু নয়ন উছলে।

কাহার নূপুর ধ্বনি
শুনাইছে আগমনী?
—বিরহী পরাণ তারে যাচে;
আশা-ময়ূরগুলি পুচ্ছ মেলি নাচে,
রাখিব পরাণখানি তার চরণতলে

(২)

মালশ্রী—ঝাঁপতাল।

ক্ষমিও, হে শিব, আর না কহিব
—দুঃখ-বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।

মৃত্তিকা কহে মোরে—"ওরে মূঢ় নর,
হৃদয় আঘাতে তব কেন এত ডর;
দীর্ণ মম বক্ষ যত আঘাত যত খর,
শস্য সুফল তত ততই শ্যাম মনোরম"।

আকাশ বলে মোরে—"আমি কাঁদি যবে,
হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে;
তোমার ও নয়ন-বারি বিফল না হবে
শুষ্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম"।

বাতুল।

কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন। ১ম, ঋতু-সংহারের ষষ্ঠ সর্গে। ২য়, মালবিকাগ্নিমিত্রের ৩য় অঙ্কে। ৩য়, কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গে, সেটি অকাল বসন্ত। ৪র্থ, রঘুবংশের নবম সর্গে। বর্ণনা ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনা ক্রমেই ছোট হইয়া আসিয়াছে, ক্রমেই বাজে জিনিস ছাঁটা পড়িয়াছে। জিনিসগুলি ক্রমেই বেশী করিয়া ফুটিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা আরও দেখিবেন ভাষা ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর ও মধুরতম হইয়া গিয়াছে। ছন্দে সুরও মধুরতর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে।

ঋতু-সংহারের ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস আটাশটি কবিতায় বসন্ত-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। তিনি বসন্তকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফুটে-উঠা আমের মুকুল তাহার বাণ, ভ্রমরের সার তাহার ধনুকের ছিলা। কামীগণ তাহার শত্রু, তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। বসন্তকালের সবই মনোহর। গাছে ফুল ফুটিয়াছে; জলে পদ্ম ফুটিয়াছে। বাতাসে গন্ধ ভরিয়াছে; যুবক যুবতীর মন উদাস হইয়াছে। যুবতীরা কুসুমফুলের রঙ্গে ছোপাইয়া রেশমের কাপড় পরিয়াছে, এবং কুঙ্কুমে ছোপাইয়া রেশমের কাপড়ের ওড়না করিয়াছে। তাঁহাদের কানে গোছা গোছা সোঁদালের ফুল, অলকে অশোকফুল, এবং সর্ব্বাঙ্গে নবমল্লিকাফুলের অলঙ্কার। শীত-কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা মুক্তার হারে চন্দন লাগাইয়া গলায় পরিতেছেন। খুব পালিস-করা বালা ও বাজু পরিতেছেন এবং কোমরে চন্দ্রহারও পরিতেছেন। এতদিন তাঁহাদের মুখে যে অলকা তিলকা কাটা থাকিত, তাহা একবার কাটিলে অনেকদিন

চলিত, কিন্তু এখন আর সেটি হইবার যো নাই, বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়া সেগুলিকে উঠাইয়া দিতেছে। অনঙ্গের আবির্ভাবে যুবতীগণের চক্ষু চঞ্চল হইতেছে, কপোল পাণ্ডুবর্ণ হইতেছে, শরীরবন্ধ শিথিল হইতেছে এবং বার বার মুখে হাই উঠিতেছে। তাহারা প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, চন্দন ও মৃগনাভি মিলাইয়া অঙ্গরাগ করিতেছেন। মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরিতেছেন ও অগুরুধূপের ধোঁয়া দিয়া তাহাকে সুবাসিত করিতেছেন।

বসন্তে আমের মুকুল খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া কোকিল কোকিলার মুখচুম্বন করিতেছে, ভ্রমরও পদ্মের মধু খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গান করিয়া ভ্রমরীর মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমের মুকুলগুলি ফুটিয়াছে, তাহার নীচে কচি কচি রাঙ্গা দু'একটি পাতা রহিয়াছে, বাতাসের ভরে গাছটি কাঁপিতেছে দেখিয়া মানুষের মন আকুল হইয়া উঠিতেছে। অশোকগাছের গোড়া হইতে রাঙ্গা ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপর অশোকের কচি কচি চাটাল চাটাল গরদ কাপড়ের মত পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া কোন্ যুবক বা যুবতীর মন স্থির থাকিতে পারে? আমের মুকুলে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপর, চারিদিক হইতে ভ্রমরেরা মত্ত হইয়া তাহার উপর পড়িতেছে, আর কচি পাতাগুলি অল্প বাতাসে তাহাদের উপর ঝুলিয়া পড়িতেছে। অতিমুক্তলতা দেখিয়া রসিকের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ উন্মত্ত ভ্রমর এক একবার ফুলে বসিতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে, আর তার কচি পাতাগুলি মৃদু বাতাসে নীচুমুখ হইয়া দুলিতেছে। কুরুবকের ফুল ফুটিয়াছে। মঞ্জরীর চারিপাশে ফুল ঠিক যেন একখানি সুন্দর মুখ। সে মুখ দেখিয়া কাহার মন না উড়ু উড়ু করে। চারিদিকে পলাশের ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের ভরে গাছ সব নুইয়া পড়িয়াছে ও তাহার উপর বাতাস বহিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিকে পলাশবনে আচ্ছন্ন হওয়ায়, বোধ হয়, যেন

পৃথিবী লাল চেলী পরিয়া আবার বিয়ের ক'নে সাজিয়াছেন। একে তো চারিদিকে পলাশ ফুটিয়াছে, ফুলগুলা যেন টিয়াপাখীর ঠোঁট, তার উপর সোঁদালের ফুল, ইহার উপর আবার কোকিল ডাকিতেছে, এসময় কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? এসময়ের বাতাস বড় মিষ্ট, কারণ হিম আর পড়ে না, বাতাস গায়ে লাগিলে মনের একটু স্ফূর্ত্তি হয়। বাতাস আসে, আমের বোল কাঁপিয়ে, বাতাস আসে, দূর হ'তে কোকিলের স্বর ব'হে নিয়ে। এ বাতাসে সকলেরই মন মোহিত হইয়া যায়। কুঁদফুলে বাগান আলো ক'রে রয়েছে; দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রসিকা যুবতী হাসিতেছে। এ সময়ের পাহাড়গুলি দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। পাহাড়ের চারিদিকে ফুলের গাছ ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে; কোকিলের ডাক পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেখানে তক্তার মত বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, সেইখানেই শিলাজতু বাহির হইয়া গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। এই সময়ে বসন্তের সহচর অনঙ্গ তোমাদের মঙ্গল করুন। আম্রের মনোহর মঞ্জরী তাঁহার শর হইয়াছে, পলাশের ফুল তাঁহার ধনু হইয়াছে, ভ্রমরকুল তাঁহার জ্যা হইয়াছে। নহিলে ধনুকের ছিলা টানিলে গুন্ গুন্ শব্দ হয় কেন? চন্দ্র তাঁহার শ্বেতছত্র হইয়াছে, মলয়ানিল তাঁহার মত্ত হস্তী হইয়াছে, কোকিলেরা তাঁহার স্তুতিপাঠক হইয়াছে, এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের বলে তিনি সর্ব্বলোক জয় করিতেছেন।

এই এক রকম বর্ণনা; যেমনটি দেখা তেমনটিই লেখা। সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল কালিদাসের কবিত্বমাত্র। সে কবিত্ব এখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই, এখনও উপমার বাহার নাই, উৎপ্রেক্ষার চটক নাই, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই।

মালবিকাগ্নিমিত্রের বসন্ত-বর্ণনা।

মালবিকাগ্নিমিত্রের ৩য় অঙ্কে রাজা বিদূষকের সহিত প্রমোদকাননে আসিতেছেন। ২য় অঙ্কে তাঁহার মালবিকার সহিত দেখা

হইয়াছে, তিনি মালবিকার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। তাহার অত্যন্ত প্রণয়িনী ইরাবতীকে তাঁহার আর মনে ধরিতেছে না। যাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি দাসীকে রাণী করিয়াছিলেন, সেই ইরাবতী তাঁহাকে আজি বসন্তের প্রথম পুষ্প উপহার দিবে বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। দু'জনে দোলায় চড়িয়া দোল খাইবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রাজা প্রমোদ-বনে যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার পা উঠিতেছে না, মন সরিতেছে না, কারণ ইরাবতী যদি কোনরূপে টের পায় রাজার মন অন্যের প্রতি আসক্ত, তাহা হইলে সে প্রমাদ করিয়া ফেলিবে। রাজা বরং তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন না, কিন্তু তবুও তাহার কাছে ধরা দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিদূষক বরং রাজাকে বলিলেন, রাণীদের সকলের উপরই আপনার সমান ভাব থাকা উচিত। রাজা কহিলেন "তবে চল"।

এইখানে প্রমোদবনে বসন্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইল। বিদূষক বলিলেন, প্রমোদ-বন যে পল্লব-অঙ্গুলি নাড়িয়া আপনি "শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন" বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে। এই সময়ে বসন্তের হাওয়া রাজার গায়ে লাগিল। রাজা বলিলেন, বসন্ত বড় উচ্চবংশজাত, বড় সহৃদয়। সে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেমন মদন-বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছ ত? নহিলে কোকিলেরা অমন করিয়া ডাকিতেছে কেন? তাহারা উন্মত্ত হইয়া ডাকিতেছে, আমার কান ভরিয়া যাইতেছে। বসন্তই কোকিলের মুখ দিয়া আমার বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আবার দেখ, আমের মুকুলের গন্ধে ভরিয়া মলয়-মারুত আমার গায়ে লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন বসন্ত আমার বিরহ-জ্বালা নিভাইবার জন্য আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

বিদূষক প্রমোদ-বনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বয়স্য, দেখ দেখ বসন্তলক্ষ্মী যেন তোমার মন ভুলাইবার জন্যই ফুলের গহনা পরিয়া আছে। যুবতীর বেশ এ বেশের কাছে কোথায় লাগে?

রাজা বলিলেন, দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। ঠাকুরাণীরা রাঙ্গা ঠোঁটে আলতা পরেন, কিন্তু এক অশোক-ফুলেই বসন্ত-লক্ষ্মী সে আলতার উপরে উঠিয়াছেন। আর এই যে কুরুবকের ফুল,—কোনটি কাল—কোনটি শাদা—কোনটি রাঙ্গা—ঠাকুরাণীরা যে অলকা তিলকা পরেন সে কি এর কাছে লাগে? তাঁহারা যে তিলক কাটেন সে তিলকে আর বসন্তের তিলক-ফুলে ঢের তফাৎ; বিশেষ যখন সে ফুলে ভ্রমর গিয়া অঞ্জনের কাজ করে। স্ত্রীলোকেরা মুখের শোভা বৃদ্ধির জন্য যা কিছু করিয়া থাকেন, বসন্ত-লক্ষ্মী যেন সেগুলাকে অবজ্ঞা করিতেছেন।

যখন মালবিকা তরুরাজিমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার দিকে আসিতেছেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, দেখ, ইহার গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, গায়ে কয়েকখানি মাত্র গহনা রহিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ইনি বসন্তকালের কুন্দলতা। কুন্দলতা মাঘমাসে ফুলে ভরিয়া থাকে; যত বসন্ত আসিতে থাকে, ইহার ফুল আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। আর উহার সবুজ পাতাগুলি পাকিয়া শাদা হইয়া যায়। সুতরাং মালবিকার এখনকার অবস্থার সহিত উহার তুলনা হইয়াছে।

মালবিকাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া যখন বিদূষক ইঙ্গিত করিলেন, এ তোমারই জন্য উৎকণ্ঠা, তখন রাজা বলিলেন, মলয়-মারুত গায়ে লাগিলে অকারণেও উৎকণ্ঠা হয়। কারণ মলয়-মারুত কুরুবকের ধূলি মাখিয়া সুবাসিত হয়; আর কচি কচি পাতাগুলির জোড় খুলিয়া ভিতর হইতে ঠাণ্ডা জলের কণা চুরি করিয়া ঠাণ্ডা হয়। মলয়মারুতই মালবিকার উৎকণ্ঠার কারণ।

এই অঙ্কে মালবিকা আসিয়াছেন অশোকের দোহদ করিবার জন্য। যে অশোকগাছের ফুল ফুটে না, অথবা ফুল ফুটিতে দেরী হয়, কবিরা মনে করেন, কোন নিখুঁত সুন্দরী যদি সাজিয়া গুজিয়া নূপুর পরিয়া সেই অশোককে পদাঘাত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

তাহার ফুল ফুটে। তাই রাণী মালবিকা দাসীকে নিজের সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া প্রমোদ-কাননে এইরূপ এক অশোকগাছে পদাঘাত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। মালবিকার সাজসজ্জায় বসন্তের ফুল, বসন্তের পল্লব, বসন্তের মুকুলও আছে। মালবিকার চরণ-স্পর্শ মাত্র অশোকগাছ ফুলে ভরিয়া গেল। তাই দেখিয়া রাজা বলিলেন, অশোকের পল্লব লইয়া উনি কানের গহনা করিয়াছেন, আর তাহারই বদলে নিজের চরণখানি তাহাকে দিতেছেন। বেশ সমান সমান বিনিময় হইতেছে।

এ সকলই বসন্ত-বর্ণনা। ফুল ফল গাছ পালার বর্ণনা ত আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা অনুরাগ প্রভৃতিও আছে। উৎকণ্ঠা অনুরাগের সঙ্গে ঈর্ষা দ্বেষও আছে। কিন্তু ঈর্ষা দ্বেষ মালবিকার নহে, ইরাবতীর। উভয়েই বসন্তকালে ক্রীড়া করিতে আসিয়াছিলেন। যিনি স্বপ্নেও দুর্লভ পদার্থ পাইলেন, তিনি আনন্দে ভোর হইলেন; আর যিনি পাওয়া ধন হারাইলেন, তিনি ঈর্ষায় কলুষিত হইলেন।

কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনা।

কুমারসম্ভবের বসন্ত অকাল বসন্ত। দারুণ শীতের মধ্যে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বসন্ত আসিল, দেখিয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বসিয়া যাঁহারা যোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যোগের মহাবিঘ্ন উপস্থিত। সূর্য্য দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে গেলেন। দক্ষিণ দিক যেন প্রিয়-বিরহে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাই একটু একটু গরম মলয়বাতাস বহিতে লাগিল। স্বয়ং মূর্ত্তিমান বসন্ত উপস্থিত, তাই অশোকগাছ আগাগোড়া ফুলে ভরিয়া গেল। যুবতীর পাদপ্রহারের জন্য অপেক্ষা করিল না। নূতন আমের মুকুল ফুটিয়া উঠিল, তাহার গোড়া হইতে গুটিকতক লাল কচি কচি পাতা বাহির হইল। তাহাতে ভ্রমর আসিয়া জুটিল, বোধ হইল যেন মদনের চোকা বাণ। পাতাগুলি বাণের পাখা, আর ভ্রমরগুলি ধনুকধারীর নামের অক্ষর। সোঁদালের ফুল ফুটিয়া উঠিল,

উজ্জ্বল রঙে দিক আলো করিয়া রহিল। পলাশ ঘোরাল লাল, এখনও ফুটে নাই—বাঁকা হইয়া রহিয়াছে, যেন সুন্দরী যুবতীর গায়ে নখের দাগ রহিয়াছে। তিলক ফুল ফুটিয়াছে, তাহাতে সারি সারি ভ্রমর বসিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী মুখে অলকা তিলকা কাটিয়াছেন। আমের কচিপাতা বসন্তলক্ষ্মীর ওষ্ঠ, তাহাতে সূর্য্যের লাল কিরণ পড়িয়াছে, যেন তিনি লাল ঠোঁটে আলতা দিয়াছেন। পিয়াশাল গাছের মঞ্জরী বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রাশি রাশি ধূলা বাহির হইতেছে, বসন্তের আগমনে হরিণগুলা মদমত্ত হইয়া ঘুরিতেছে, আর তাহাদের চক্ষে সেই ধূলা পড়িতেছে; তাহারা বনের ভিতর দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের পায়ের চাপে তলায় পড়া শুক্‌না পাতাগুলি মড়্ মড়্ করিয়া শব্দ করিতেছে। কোকিলেরা আমের মুকুল খাইতেছে, কষা জিনিস খাওয়ায় তাহাদের গলা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, আর তাহারা কুহু কুহু রবে বন মাতাইয়া দিতেছে। যেসব গরবিণী মান করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান সেই কুহু-স্বর শুনিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কিন্নরীরা শীতকালে মুখে অলকা তিলকা কাটিয়াছিলেন, তখন একবার কাটিলে অনেক দিন থাকিত, এখন একটু গরম পড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে, আর অলকা তিলকাগুলি উঠিয়া পড়িতেছে।

পশুপক্ষীরাও বসন্তের প্রভাব অনুভব করিতে লাগিল এবং আপন আপন প্রিয়ার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ভ্রমর ভ্রমরীর সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর একই ফুলে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কৃষ্ণসার শিং দিয়া মৃগীর গা চুলকাইয়া দিতেছে আর মৃগী চক্ষু বুজিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে। হস্তিনী পদ্মপুকুরের সুগন্ধি জল শুঁড়ে লইয়া অনুরাগভরে হস্তীকে দিতেছে, আর চক্রবাক একটি মৃণালের অর্দ্ধেক খাইয়া বাকী আধখানি চক্রবাকীকে দিতেছে। কিন্নরী ফুলের মদ খাইয়া গান ধরিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু ঘুরিতেছে, পরিশ্রমে ঘাম হইতেছে, অলকাতিলকাগুলি

ফুলিয়া উঠিতেছে, কিন্নর সে মুখ দেখিয়া কি আর মনের বেগ সংবরণ করিতে পারে? লতা আসিয়া তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে, বড় বড় ফুলের থোকা তাহাদের স্তন, লাল লাল কচি কচি পাতাগুলি তাহাদের ওষ্ঠ হইয়াছে, আর তাহাদের শাখাগুলি হাতের মত নীচের দিকে ঝুলিতেছে। অপ্সরারা গীতি আরম্ভ করিয়াছেন।

এই ত হইল কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত-বর্ণনা। ইহার পর পার্ব্বতী আসিতেছেন। তিনিও কবির বসন্ত-বর্ণনে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার গায়ে অশোকফুলের গহনা, পদ্মরাগ মণি তাহার কাছে কোথায় লাগে। সোঁদালের ফুলের গহনা দেখিয়া কে বলিবে এ সোণার গহনা নয়? নিসিন্দা ফুলের হার হইয়াছে যেন সত্য সত্যই মুক্তার হার। তিনি এত ফুলের গহনা পরিয়াছেন যে ফুলের ভরে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বোধ হইতেছে যেন ফুলে ও পাতায় ভরা একটি লতা চলিয়া যাইতেছে। বকুলফুল তাঁহার চন্দ্রহার হইয়াছে, সেটা যত পড়িয়া যাইতেছে তিনি ততই তাহাকে টানিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাসের গন্ধে অন্ধ হইয়া ভ্রমর তাঁহার মুখের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর তিনি হাতের পদ্ম দিয়া তাহাকে তাড়াইতেছেন।

রঘুবংশের বসন্ত-বর্ণনা।

রঘুর নবম সর্গে কালিদাস আর একবার বসন্তবর্ণনা করিয়াছেন। দশরথরাজা খুব ভাল রাজত্ব করিতেছেন দেখিয়া বসন্ত পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব কুবেরের দেশে যাইবার জন্যই যেন ঘোড়া ফিরাইয়া মলয়পর্ব্বত ত্যাগ করিলেন। বরফ গলিয়া গেল। প্রভাত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। যে বনে বড় বড় গাছ ছিল তাহাতে প্রথম ফুল ফুটিল, তাহার পর নূতন পাতা গজাইল। তাহার পর ভ্রমর ও কোকিল ডাকিয়া উঠিল। এইরূপে একের পর আর আসিয়া বসন্তকে প্রকাশ করিল। পলাশগাছে কুঁড়ি ধরিল, যেন

তাহার গায়ে নখের দাগ পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব শিশির শুখাইয়া দিলেন, কারণ হিমে স্ত্রীলোকদিগের অধরে বড় যাতনা হয়, আর উহারা চন্দ্রহার পরিতে পারে না।

আমের শাখায় মঞ্জরী বাঁধিল। আর শাখাটি মলয়-মারুতে দুলিতে লাগিল, বোধ হইল যেন সে ঋষিদিগেরও মন ভুলাইবার জন্য অভিনয় শিক্ষা করিতেছে। যেখানে যত ভ্রমর ছিল, আর জলে পাখী ছিল তাহারা আসিয়া পদ্মবনের চারিদিকে জুটিল, কেননা পদ্মে এখন খুব মধু। এইরূপেই লোকের যখন খুব সম্পদ হয় তখন নানা লোকে তাহার নিকট উপকার পাইবার জন্য উপস্থিত হয়। অশোকতরুর ফুলই যে কেবল লোকের মন উড়ু উড়ু করিয়া দেয় এমন নহে। উহার কচি কচি পাতাগুলিও স্ত্রীলোকের কানে লাগাইয়া রাখিলে লোকের মন কেমন কেমন করিতে থাকে। কুরুবকের ফুল ফুটিল, বোধ হইল যেন বসন্ত উদ্যান-লক্ষ্মীর মুখে অলকা তিলকা কাটিয়া দিলেন। কুরুবকে যথেষ্ট মধু আছে, মধুকরেরাও চারিদিকে খুব রব তুলিয়া দিল। মধুলুব্ধ মধুকরেরা লম্বা লম্বা সারি বাঁধিয়া বকুলগাছকে আকুল করিয়া তুলিল, কেননা তাহার ফুল ফুটিয়াছে। সে ফুলের গন্ধ সুগন্ধ মদের ন্যায়। সুন্দরীরা মদের গণ্ডূষ না দিলে ত তাহার ফুল ফুটে না। কুসুমিত বনরাজিতে কোকিলের প্রথম ডাক শোনা গেল। যেন নূতন বৌ দু'টি একটি কথা কহিতেছে। উপবনের লতাগুলিতে নূতন কচি পাতা বাহির হইয়াছে, তাহাতে বাতাস লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সে হাত দিয়া ভ্রমরের গানে লয় দিতেছে। ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মদ্য নিজের গন্ধে বকুল ফুলের গন্ধকে পরাজয় করিয়াছে। মদ্যপান করিলে মনের ভাব নানারূপ হইয়া যায়, তাই স্ত্রীলোকে স্বামীর সহিত মদ্যপান করিতেছে। রাজবাড়ীর দীঘীগুলিতে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, নানাজাতীয় জলচর পক্ষী আনন্দভরে কলরব করিতে করিতে তাহার উপর সার বাঁধিয়া যাই-

তেছে, বোধ হইতেছে দীঘীগুলি যেন রমণী সাজিয়াছে; পদ্মগুলি তাহাদের হাসি হাসি মুখ, আর পাখীব সারগুলি তাহাদের চন্দ্রহার, শব্দ করিতেছে আর ধনুর আকারে বাঁকিয়া পড়িয়াছে। বসন্তের আগমনে রজনী কৃশ হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর আবার চন্দ্রের উদয়ে তাহার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন প্রিয়-বিরহে কোন বধূ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছেন ও তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। হিমের কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, চন্দ্রের কিরণ পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্র যেন এই সকল কিরণের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধি করিতেছে। আহুতি প্রদান করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির যেরূপ রং হয়, সোঁদাল ফুলের রং তেমনি হইয়াছে। উহা এখন সোণার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছে। উহার পাপ্‌ড়ী দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়, উহার কেশর দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। তাই মনের মানুষ যখন রমণীর ঝাপটায় ঐ ফুল ঝুলাইয়া দিতেছেন, তিনি মনের আনন্দে তাহা ধারণ করিতেছেন। বনস্থলীতে তিলক ফুলের গাছ রহিয়াছে। উহাতে শাদাফুল সারি দিয়া ফুটিয়া আছে, তাহাতে কাজলের ন্যায় কাল ভ্রমরের দল পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন একটি স্ত্রীলোকের মুখে অলকা তিলকা কাটা হইয়াছে। নবমল্লিকা মধুর গন্ধে মন মাতাইয়া দিতেছে, তাঁহার ফুল ফুটিয়াছে, তিনি যেন বিলাসভরে তরুর উপর উঠিয়া হাসিতেছেন; আর কচি কচি লাল পাতাগুলির উপর ফুলের আভা পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনীর অধরে হাসি খেলিতেছে। এসময়ে নূতন কচি পাতাগুলি লাল হইয়া উঠিতেছে, যবের অঙ্কুরগুলি স্ত্রীলোকেরা কানে পরিতেছে। কোকিলেরা কুহু কুহু করিয়া দেশ মাতাইতেছে, এসময়ে কি বিলাসীরা স্থির থাকিতে পারে? তিলক গাছের মঞ্জরীতে শাদা শাদা ফুল ফুটিয়াছে। চারিদিকে পরাগ উড়িতেছে, তাহাতে মঞ্জরীর দেহ যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর সারি সারি ভ্রমর আসিয়া বসিতেছে। বোধ হইতেছে যেন কোন

রমণীর কাল ঝাপটায় সারি সারি মুক্তার মালা রহিয়াছে। মুক্তাগুলি খুব উজ্জ্বল, তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোক বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অলকগুলি ভ্রমরশ্রেণীর স্থায় দেখা যাইতেছে। উপবনে মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের কেশর হইতে রেণু উড়িয়া দিগন্ত ব্যাপ্ত করিতেছে, সে রেণুরাশি ধনুকধারী মদনের পতাকার স্থায় দেখা যাইতেছে, এবং সেই রেণুতে বসন্তলক্ষ্মী মুখময় যেন পাউডার মাখিয়া সাজিয়া বসিয়া আছেন। ক্রমে দোল আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক যুবতী দোলায় দুলিতে গেলেন। যুবতী দোলার দড়া ধরিতে বেশ পটু, তথাপি তিনি ভাণ করিতে লাগিলেন, তাহার হাত যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, তিনি যেন দড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছা প্রিয়ের কণ্ঠধারণ করিয়া তিনি দোল খান। গরবিণী মান করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে কোকিল ডাকিল। সে ডাকে যেন বলিল, মানিনী, মান ত্যাগ কর, মিছে কেন ঝগড়া কর, এ যৌবন বড় চঞ্চল, একবার যাইলে আর ফিরিয়া আসিবে না, অতএব মান আর রেখ না। কোকিলার ডাকে এই কথাটা শুনিয়া মানিনী আপনিই মান ত্যাগ করিলেন, আবার উভয়ের মিলন হইয়া গেল।

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি জায়গারই ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিলাম। ব্যাখ্যা মানে ব্যাকরণ লাগাইয়া নয়, বাদার্থ লাগাইয়া নয়, অলঙ্কার লাগাইয়া নয়, ছন্দ লাগাইয়া নয়, অভিধান লাগাইয়াও নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত কালিদাসের কবিত্ব মিলাইবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালিদাস কি চক্ষে স্বভা-বের শোভা দেখিতেন, তাই বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালি-দাস কত যত্ন করিয়া কত নিপুণ হইয়া প্রকৃতির কার্য্যকলাপ দেখিতেন, কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছোট বড় সব প্রকারের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেবার জন্যই এই প্রস্তাব।

কালিদাস অল্পবয়সে এমনকি তাঁহার পড়িবার সময়েই ঋতুসংহার লিখেন। তাঁহার যেদেশে বাড়ী, সেদেশের কবিদের ঋতুবর্ণনা একটা রোগ ছিল। লোকে শিলালেখ লিখে, কোন ধর্ম্ম করিলে তাঁহার স্মরণার্থ। শিলালেখ লিখিলেই তাহাতে তারিখ দিতে হয়, প্রথম বৎসর, তাহার পর মাস, তাহার পর মাসের দিন। কালিদাসের দেশের কবিরা তারিখ দিতে গিয়া সেই ফাঁকে একটু ঋতুবর্ণনা করিতেন। আমরা খ্রীঃ ৪০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীঃ ৫৩৩ পর্য্যন্ত যতগুলি শিলালেখ পাইয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই ঋতুবর্ণনা। কালিদাস সেইদেশেরই লোক, তিনিই বা ছাড়িবেন কেন, সমস্ত ঋতু-গুলির বর্ণনা লইয়া তিনিও একখানি বৈ লিখিলেন। অন্য ঋতুর বর্ণনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা বসন্ত ঋতুর কথাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋতুসংহারে যেমনটি দেখা, তেমনই লিখা—দেখাও তাঁহার নিজের বাড়ীর কাছেই। এখনও তাঁহার হাত পাকে নাই, তিনি নবিস্ মাত্র। দেশের রোগও তিনি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় তিনি অতিমুক্তলতার খুব জাঁকাল বর্ণনা করিয়াছেন। এই লতা মাধবীলতার মত। বিশেষের মধ্যে এই, রাত্রি ৪টার সময় ফুটিয়া অতিমুক্ত বেলা ৮টার মধ্যেই ঝরিয়া যায়, তাই এ'র নাম অতিমুক্তলতা। মালবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইহা দেখা যায়। কালিদাস বসন্তবর্ণনায় ঋতুসংহারেই অতিমুক্তলতার বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার কুমার, রঘু কি মাল-বিকাগ্নিমিত্র—ইহার কোনটিতেই অতিমুক্তলতা নাই। মালবিকা পূর্ব্ব-মালবের জিনিস, কালিদাস সেখানেও অতিমুক্তলতার বর্ণনা করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম কালিদাস নিজের বাড়ী বসিয়াই যেমনটি দেখিয়াছিলেন, তেমনই লিখিয়াছেন।

ঋতুসংহারে হেমন্তবর্ণনায় কালিদাস প্রিয়ঙ্গুর নাম করিয়াছেন, প্রিয়ঙ্গু তাঁহার দেশে জন্মিত। বর্ষায় গাছ হইত, শরতে উহার খুব

শ্রীবৃদ্ধি হইত, প্রতিডালে আগাগোড়া ফুল ফুটিত, ডাল উচা হইয়া থাকিত, ঠিক যেন স্ত্রীলোকের একখানি হাত—আগাগোড়া গহনা-পরা। হেমন্তে গাছ শুকাইয়া যাইত, পাতা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত, বোধ হইত যেন প্রিয়-বিরহেই শুকাইয়া যাইতেছে। প্রিয়ঙ্গু কালিদাসের দেশে যথেষ্ট হইত, তাই তিনি বসন্তকালেও উহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বসন্তবর্ণনায় তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক ও কুঙ্কুম ঘষিয়া স্তনে লেপ দিতেছে।

তাঁহার হাত যে এখনও পাকে নাই, তাহার প্রমাণ এই, তিনি বসন্তে কুন্দফুলের খুব বর্ণনা করিয়াছেন। ঋতুসংহারে তিনি বলিতেছেন, কুন্দফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। কুন্দলতা কিন্তু বসন্তে বাগান আলো করার মত কখনই ফুটে না, শীতেই এইরূপ হয়। তাই তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে কথাটা সারিয়া লইয়া বলিলেন—

"মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা॥"

কুমারসম্ভব কি রঘুবংশে উহার নামও করিলেন না।

ঋতুসংহারে বসন্তঋতু যেন বিলাসিনীদের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সুতরাং সেইদিকের বর্ণনাই বেশী। অন্যত্র বিলাসিনীদের এত ছড়াছড়ি নাই। রূপকও ঋতুসংহারেই বেশী। প্রথমেও তিনি বসন্তকে যোদ্ধা সাজাইয়াছেন, শেষেও যোদ্ধৃবেশেই তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন।

ক্রমশঃ বসন্তবর্ণনায় কালিদাসের কেমন হাত পাকিয়া উঠিল, তাহাই তুলনা করিয়া দেখাইব।

গুঞ্জন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ
প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু॥

কুঃ সং মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।

কুমারসম্ভবে অনুরাগের ভর কত বেশী।

ঋঃ সং পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ
কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন
পর্য্যাকুলং কুলগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্॥

কুঃ সং চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য॥

রঃ বং ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ
ন পুনরৈতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে
স্মরমতে রমতেস্ম বধূজনঃ॥

কোকিল আর ভ্রমর উভয়ে মিলিয়া মধুর স্বরে কুলবতীর মন উচাটন করিয়া দিল। এটি নিশ্চয়ই প্রথম বয়সের লেখা। অধিক বয়সে কালিদাস বুঝিলেন মন উচাটন কোকিলের স্বরে যেমনটি হয়, তেমনটি ভ্রমরের স্বরে হয় না। তাই কুমারসম্ভবে কালিদাস ভ্রমরকে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। কোকিলের কূজনেই মানিনীর মান-ভঞ্জন করিয়া দিল। কিন্তু কি কথায় মানভঞ্জন হইল, তাহা এখানে বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। সেকথাটি রঘুবংশে প্রকাশ পাইল। যখন রঘুবংশ লেখা হয়, তখন কালিদাসের বয়স অনেক গড়াইয়া গিয়াছে। কারণ অল্পবয়সে এমন কি চল্লিশের পূর্ব্বে "চতুর বয়স একবার গেলে আর ফিরিবার নয়"—একথা কাহারও মনেই আসে না। অনেকে নাক সিটকাইয়া বলিবেন, "ছিঃ মানভঞ্জনের কথায় বৈরাগ্যের কথাটা তুলা ভাল হইয়াছে কি?" তাহার উত্তর এই যে মানভঞ্জনই দরকার, তা, "যেন তেন প্রকারেণ"। এইরূপ তুলনায় কিরূপে ক্রমে ক্রমে কালিদাসের হাত পাকিয়াছিল, আমরা তাহার উদাহরণ দিলাম।

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কালিদাসের মতি ক্রমে পাকি-য়াছে। ঋতুসংহারে তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করেন নাই। বসন্তে যেমন ফুল ফুটে, কোকিল ডাকে, ভ্রমর ভ্রমরী এক-সঙ্গে বেড়ায়, যেমনটি স্বভাবে দেখা যায়, তাহাই তিনি বর্ণনা করি-য়াছেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বভাববর্ণনা মাত্র। তাহারা মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরে। কুসুমফুলের রঙে কাপড় ছোপায়, অঙ্গরাগ করে, চন্দ্রহার পরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাল-বিকাগ্নিমিত্রেই প্রথম স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বভাব-সৌন্দ-র্য্যের তুলনা দেখা যায়। এ তুলনায় স্বভাবের সৌন্দর্য্যই বড়, স্ত্রীলো-কের সৌন্দর্য্য তাহার কাছে লাগে না। স্বভাবকবি এখনও স্বভাব লইয়াই মত্ত—স্ত্রীলোকের শোভা তাঁহার মনে ধরে না। কুমার-সম্ভবে আর একটি ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে স্বভাবের শোভা ও স্ত্রীলোকের শোভায় খুব একটা মিশামিশি ভাব। কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট, কবি এখন ধোঁকায় পড়িয়াছেন। তাই খানিক স্বভাব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন

"কাষ্ঠাগত স্নেহরসানুবিদ্ধং
"দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবক্রুঃ।"

এই বলিয়া তিনি ভ্রমর-ভ্রমরী, মৃগ-মৃগী, হস্তি-হস্তিনী, চক্রবাক-চক্র-বাকী, কিন্নর-কিন্নরী—প্রভৃতির প্রেমময় ভাব বর্ণনা করিলেন। এমনকি বৃক্ষলতাকেও নায়কনায়িকা সাজাইয়া বর্ণনা করিলেন। এই যে প্রেমের ভাব, ইহাতে স্ত্রীসৌন্দর্য্যের উপর কবির যথেষ্ট আস্থা প্রকাশ পাইতেছে।

আবার পটপরিবর্ত্তন কর। রঘুবংশে দেখ সমস্ত স্বভাব স্ত্রীলো-কের নিকট সৌন্দর্য্য শিক্ষা করিতেছে—কেহবা অভিনয়, কেহবা তাল দেওয়া শিখিতেছে। এখানে স্ত্রীসৌন্দর্য্যই প্রধান; স্বভাব-সৌন্দর্য্য তাহার পশ্চাতে। এতদিন স্ত্রীসৌন্দর্য্য উপমেয় ছিল, স্বভাব-

সৌন্দর্য্য উপমান ছিল। এখন স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইল উপমেয়, আর স্ত্রীসৌন্দর্য্য উপমান।

এই এক বসন্ত-বর্ণনার তুলনা করিয়াই আমাদের বেশ বোধ হয় যে কালিদাস অতি অল্প বয়সেই ঋতুসংহার লিখিয়াছিলেন; তাহার পর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মাতিয়া মালবিকাগ্নিমিত্র বাহির করেন; ক্রমে, হয় ত বিবাহের পর, মেঘদূতে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন; বয়স পাকিয়া আসিলে কুমারসম্ভবে স্বভাব-সৌন্দর্য্য ও স্ত্রীসৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করেন; এবং শেষ বয়সে, রঘুবংশে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের উপর স্ত্রীসৌন্দর্য্য দাঁড় করাইয়া দেখাইলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

গান

ওগো হৃদয়-রতন! ওগো মনেরি মতন!
কি দিয়ে পূজিব আজি, সাজাব চরণ?
তুমি যে আসিবে আমি বুঝিতে পারিনি,
আমি যে রাখিনি ডালা সাজায়ে!

কি গান গাহিব আর, কি শুনিবে বল?
তনু কাঁপে থর থর, হৃদয় উছল।
পরাণ-বীণার তার সবি ছিঁড়ে গেছে—
সে তারে কি সুর দিব, বাজায়ে?

কেমনে গাঁথিব মালা, কোথা পাব ফুল?
আমি যে জীবন ভ'রে করিয়াছি ভুল!
আমি যে রেখেছি শুধু যাতনা-কুসুম
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, কুড়ায়ে!

যাহা আছে লও তাই, কর সব মধু
রচি দাও মধু-চক্র প্রাণ-কুঞ্জে বঁধু!
এস এস মধুকর, মন-মধুকর!
এস, তনু মন প্রাণ জুড়ায়ে!

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১১]

(মাঘের নারায়ণের ৩১৭ পৃষ্ঠার ক্রমানুবৃত্তি)

ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৬)

প্রকৃতি কি ?

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের পূর্ব্বেও প্রকৃতি শব্দ দুই চারিবার পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রকৃতির একটা বিশেষ অর্থ পাই। তৃতীয় অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে গীতা প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আর সেখানে প্রকৃতি শব্দে মোটের উপরে আমরা সচরাচর যাহাকে স্বভাব বলি, তাই বুঝাইয়াছে। প্রথম,—পঞ্চম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যে জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানীই হউক, দেহী মাত্রেই আপনার স্বভাবের প্রেরণায়, অবশে, যন্ত্রারূঢ়ের মতন সকল প্রকারের কর্ম্ম করিয়া থাকে; কেহই কোনও অবস্থাতে কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩য়।৫

প্রকৃতিজ বা স্বভাবজ গুণের প্রেরণায় সকলকেই যন্ত্রারূঢ়ের মতন সর্ব্বকর্ম্ম করিতে হয়। যে বস্তু যে ভাবে গঠিত, তাই তার স্বভাব। এই স্বভাবকেই এখানে প্রকৃতি বলিয়াছেন। মানুষ এমনিভাবে গঠিত যে তাহাকে সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে হয়। একান্তভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে তার পক্ষে দেহধারণই অসাধ্য হইয়া উঠে।

শরীরযাত্রাপি তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ৩য়।৮।

"একান্ত কর্ম্মবর্জ্জিত হইলে তোমার শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত অসাধ্য হয়।"

মানুষ বলিতেই আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যার আছে, এমন জীব বুঝি। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের সম্মুখীন হইবা-মাত্রই তাহাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করে। রূপের সংস্পর্শে চক্ষু, শব্দের সংস্পর্শে কর্ণ, রসের সংস্পর্শে রসনা,—আপন আপন স্বভাবের প্রেরণাতেই দর্শন শ্রবণ আস্বাদনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে জ্ঞানী আত্মস্থ হইয়া, স্বভাব আপনার কর্ম্ম করিতেছে ভাবিয়া, তাহাতে লিপ্ত ও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না। কিন্তু অজ্ঞানী—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা", নিজেকে এ সকল স্বভাবকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩-২৭

"প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারাই যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। তবে যে সকল লোকের আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা মূঢ়ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা 'আমি (এ সকল কর্ম্মের) কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে।" এখানেও "প্রকৃতি" শব্দে সাধারণ স্বভাবই বুঝাইতেছে। তারপর উনত্রিংশ শ্লোকে—

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ॥ ৩-২৯

"অর্থাৎ "প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমূঢ় হইয়াছে যাহারা, তাহারা গুণ ও কর্ম্মেতে আসক্ত হইয়া রহে। ইহারা মন্দবুদ্ধি ও অসম্যক-দর্শী। এই সকল মন্দবুদ্ধি ও অসম্যকদর্শী লোককে সম্যকদর্শী জ্ঞানীগণ এসকল কর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবেন না।" এরূপ চেষ্টাতে কোনও শুভ ফল উৎপন্ন হইতেই পারে না। কারণ—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ৩-৩৩

অর্থাৎ—"যখন জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত আপন আপন প্রকৃতি

বা স্বভাবানুরূপ কর্ম্মচেষ্টা করিয়া থাকেন। স্বভাবকে কেহই অতি-ক্রম করিতে পারেন না। ভূতমাত্রেই আপনার প্রকৃতির প্রতি গমন করে। তখন নিগ্রহ করিয়া আর কি হইবে?"

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই চারিটি শ্লোকেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতি শব্দ পাই। আর এই চারিটি শ্লোকেই প্রকৃতি শব্দ স্বভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর চতুর্থ অধ্যায়ে, ভগবানের অবতার প্রসঙ্গে পুনরায় এই প্রকৃতি শব্দের দেখা পাই। এখানে কিন্তু ঠিক স্বভাব অর্থে প্রকৃতি শব্দ গ্রহণ করা যায় না। কারণ স্বভাবের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রকারের স্ব-বিরোধিতা থাকিতেই পারে না। কিন্তু এই শ্লোকে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ রহি-য়াছে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪-৬

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভগবান আপনার কতকগুলি গুণের, ধর্ম্মের বা লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই সকল গুণের, ধর্ম্মের বা লক্ষণের বিরোধী ও একান্ত বাধক একটা কর্ম্মের কথা কহিতেছেন। এই কর্ম্ম ঐ সকল গুণ, বা ধর্ম্মকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রথমে তিনি বলিতেছেন—আমি অজ, আমার জন্ম হয় না, হইতে পারে না। আমি—অব্যয়াত্মা, আমার ক্ষয় বা বিলোপও হয় না। আর আমি যাবতীয় ভূতগ্রামের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। এই ভূতগ্রাম জন্মমরণধর্ম্মশীল। ইহাদের নিয়ন্তারূপে আমিই ইহাদের জন্মমৃত্যুর নিয়ামক। জন্মমৃত্যুর নিয়ামক যে সে কদাপি জন্মমরণধর্ম্মসম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপে এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভগবান আপনার জন্মকর্ম্ম একান্তভাবে বাধিত করিয়া, পুনরায় দ্বিতীয়ার্দ্ধে নিজের জন্মের কথা কহিতেছেন। অজ, অব্যয়, ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও আমি—"সম্ভবামি"—জন্মগ্রহণ করি। কিরূপে? না, আত্মমায়য়া, আমার মায়া-শক্তির দ্বারা। কোন্ আশ্রয় বা করণ

বা যন্ত্র বা উপাদান লইয়া? না, "প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায়"—আমার স্বকীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া। এই "প্রকৃতি" বস্তুটি কি?

এখানে প্রকৃতি শব্দের স্বভাব অর্থ করা সম্ভব নয়। কারণ যিনি অজ, জন্মগ্রহণ না করাই তাঁর স্বভাব। যিনি অব্যয়াত্মা, কোনও প্রকারের বিকাশ বা উপচয়-অপচয়, শৈশব-বাল্য-কৈশোরাদি অবস্থান্তরলাভ না করাই তাঁর স্বভাব। আর যিনি ভূতসকলের ঈশ্বর, ভূতসকলের পরিণামধর্ম্মগ্রহণ তাঁর স্বভাব হইতেই পারে না। অথচ তিনি সম্ভূত হন; সম্ভব মাত্রেই তাঁর অজ-অব্যয়-ঈশ্বর-স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়। "আমি সম্ভূত হই—আপনার মায়াশক্তির বলে, স্বকীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া"—এখানে প্রকৃতি অর্থে কিছুতেই স্বভাব বুঝাইতে পারে না।

এই প্রকৃতি তবে কি? আমার মনে হয়, গীতা সপ্তম অধ্যায়ে এই ভাগবতী প্রকৃতি বস্তুটি যে কি, তাহাই বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের দ্বারাই চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায়ের এই দুইটি শ্লোকেই গীতোক্ত অবতারবাদের মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কারণ, যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের অবতার হয়, সেই প্রকৃতির মর্ম্ম না বুঝিলে, এই অবতার ব্যাপারই বা কি, তাহা বুঝা অসাধ্য। অন্য কোনও ভাবে ইহার অর্থ করিলে, গীতার অবতার সত্য হইতে পারেন না, মায়িক হইয়া পড়েন।

গীতার অবতারবাদ

অনেকে গীতার প্রামাণ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আপনাকে অজ, অব্যয়াত্মা, ভূতসকলের ঈশ্বর কহিতেছেন। কিন্তু তিনি আবার সম্ভূত হন। যুগে যুগে সম্ভূত হন। এই সম্ভব অর্থই দেহ-ধারণ। আর এইখানেই গোল বাধে। গীতায় যাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহা আর উপনিষদের ব্রহ্ম কি একই বস্তু? এক নয় যে, এমন কথা ত বলিতে পারি না। কারণ জগ-

তের জন্ম-আদি যাঁহা হইতে হয়, উপনিষদ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিতেছেন,

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ৭-৬।

আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ-হেতু। এই শ্লোকার্দ্ধ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রেরই বৃত্তি মাত্র। কেবল ইহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে জগতের স্থিতি-হেতু রূপেও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব॥ ৭-৭।

"হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোনও কিছুই নাই। হারের মণিসকল যেমন তার সূতাতে গাঁথা থাকে, আমাতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ গাঁথা রহিয়াছে।" এ সকল কথা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে নিঃশেষে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত,—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো,
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥

ব্রহ্মকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, মনের দ্বারা মনন করা যায় না; আমরা তাঁহাকে জানিনা, কিরূপে তাঁর সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানিনা। অন্যত্র—

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥

"ইঁহাকে কেহ উর্দ্ধে, অধোতে বা মধ্যে ধরিতে পারে না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশ, তাঁহার প্রতিমা নাই।"

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।

"দর্শন-যোগ্য প্রদেশে তাঁর রূপ নাই, কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না।" উপনিষদ বারম্বার এইরূপে ব্রহ্মের নিতান্ত নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম যদি ঈশ্বর হয়েন, তিনিও তাহা

হইলে নিতান্ত নিরাকার হইয়া যান। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তিনি ত নিরাকার নহেন। তিনি গীতাতে মানুষরূপে প্রকাশিত। এই মানুষ-রূপ কি সত্য না মিথ্যা? অর্থাৎ এই রূপ কি কেবল মায়া-মাত্র? বাস্তবিক তিনি মানুষরূপী নন; এখানে মায়া-প্রভাবে মানুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন মাত্র? এসকল প্রশ্ন উঠে। এপ্রশ্নের মীমাংসা না হইলে গীতার অবতারবাদের কোনওই কিনারা হয় না।

ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও, আপনার ঐশী শক্তিপ্রভাবে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা বলিলেও এ গোল মিটে না, বরং আরও পাকাইয়া উঠে। প্রথমতঃ এই অবতার ব্যাপারটা কি? এটা কি মায়িক, ইন্দ্রজাল মাত্র, না সত্য? নিতান্ত নিরাকার-বাদীরা গীতোক্ত অবতারবাদকে মায়িক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সকল বৈষ্ণবেও ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শঙ্কর স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বরের দেহধারণ প্রকৃত-পক্ষে অসম্ভব। তবে গীতাতে যে ভগবান বলিয়াছেন—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব, এবং যাবতীয় ভূতগ্রামের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা হইয়াও, আমার স্বকীয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, আপনার মায়াপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,—শঙ্কর এখানে "সম্ভবামি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

> দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতোলোকবৎ।

"দেহবানিব" দেহীর মত হই। এই "ইব" শব্দের দ্বারাই পর-মেশ্বর যে সত্য সত্য নররূপধারী নহেন, তবে কেবল মানুষের মতন দেখাইতেছেন, ইহাই বুঝায়। এইরূপে এক বস্তুকে অন্য-বস্তুরূপে দেখান মায়ার কর্ম্ম। আর মায়া এখানে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাকে

আছে বলিয়া দেখান ভোজের বাজী। ঈশ্বরের মানবরূপও এইরূপ ভোজের বাজী। শঙ্করের কথার এই অর্থই হয়।

মধুসূদন সরস্বতী ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য আরও ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পরমেশ্বরের ভৌতিক দেহধারণ কদাপি সম্ভব নহে, ইহাই ভাষ্যকারের কথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে যার জন্ম হয়, তারই মৃত্যুও হয়ই হয়। "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুধ্রুবংজন্ম মৃতস্য চ"—গীতাই বলিয়াছেন, যে জন্মে সে'ই মরে; যে মরে সে'ই আবার জন্মায়। আর

"তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদ্ভবতি, ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্বং চাজ্ঞস্য জীবস্য দেহাভিমানিঃ কর্ম্মাধিকারিত্বাদ্ভবতি।"

এই জন্ম ও মৃত্যু ধর্ম্মাধর্ম্মবশে হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্ব আবার দেহাভিমানী যে অজ্ঞ জীব, সে আপনার কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়াই, উৎপন্ন হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণরূপী যে ঈশ্বর তিনি ত কর্ম্মবদ্ধ নহেন। তাঁর শরীরগ্রহণ তবে সম্ভব হয় কিসে? অতএব

"ভৌতিকং শরীরং জীবনাবিষ্টং পরমেশ্বরস্য
ন সম্ভবত্যেবেতি সিদ্ধম্।"

"জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের ভৌতিক শরীর সম্ভব নহে, ইহাই নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি।" অন্যত্র, মোক্ষধর্ম্মে ভগবান নারদকে বলিয়াছেন,

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ!"

হে নারদ! তুমি আমাকে যে রূপেতে দেখিতেছ, তাহা আমি মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।"

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে ভগবানের এই মানব-রূপ ঠিক ইন্দ্রজালপ্রসূত নহে। ভগবান আপনার শুদ্ধসাত্ত্বিকী বৈষ্ণবী প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া, কর্ম্মবশে নহে কিন্তু স্বেচ্ছায়, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং

প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্ব-মূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবত-রামীত্যর্থঃ।'

কিন্তু ইহাতেও মূল প্রশ্নের উত্তর হয় না। শ্রীধরস্বামী বলি-তেছেন যে ভগবান বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। তিনি মানুষরূপে, মানবদেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হন। এই বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্ব-মূর্ত্তি কি তবে মানুষী মূর্ত্তি? মানুষী মূর্ত্তিই ত আমরা প্রত্যক্ষ করি। অবতারের এই মানুষী মূর্ত্তি কি সত্য না মায়া? বস্তু না ছায়া? বস্তু যাহা তাহা নিত্য। এই বিশুদ্ধোজ্জ্বল সত্ত্বা-ত্মিকা মানুষী মূর্ত্তি কি নিত্য না ক্ষণিক? সৎ না অসৎ? আর শ্রীধরস্বামীর কথাতে ইহার, কিম্বা এই মূর্ত্তি কোথা হইতে আসে, তাহার কোনও উত্তর পাই না। তিনি তাঁর "শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার বা আত্মসাৎ করিয়া এই বিশুদ্ধোজ্জ্বল সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন",—ইহাতেও এই প্রশ্নের উত্তর নাই। প্রশ্নটি এই, যাহা ছিল না তাহা আসে কোথা হইতে? যাঁর কোনও মূর্ত্তি নাই, কোনও আকার নাই, কোনও রূপ বা লিঙ্গ নাই, তিনি এই মূর্ত্তি পান কোথায়? গীতাই বলিতেছেন—

নাসতোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ

নাস্তির বা অবস্তুর অস্তিত্ব কিম্বা বস্তুর নাস্তিত্ব কখনও সম্ভব নহে। এই যে "বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি"র কথা শ্রীধরস্বামী বলি-তেছেন, এই মূর্ত্তি অসৎ না সৎ, অবস্তু না বস্তু? যদি অবস্তু হয়, অর্থাৎ এ মূর্ত্তি যদি চিরকালের না হয়, ইহা যদি ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে ভগবানের ভৌতিক দেহ সম্বন্ধে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর এই বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়। "মূর্ত্ত ইব চ জাত ভবামি"—শ্রীধরস্বামীকেও তাহাই বলিতে হয়। অথবা অন্যপক্ষে, এই বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয় সিদ্ধান্তের কোনও অবসর আছে বলিয়া অনুমান করাও অসম্ভব।

ফলতঃ অবতার-প্রসঙ্গে কেবল আমাদের দেশে নয়, অন্যত্রও এ সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে। খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম অবতারবাদী। আর খৃষ্টীয়ান্-মণ্ডলীমধ্যেও যীশুখৃষ্ট গ্যালিলিতে যেরূপে প্রকট হইয়াছিলেন তাহা সত্য না ইন্দ্রজাল, বাস্তব না মায়া, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। একদল খৃষ্টীয়ান্ যীশুর এই নরলীলাকে—apparent, real নহে,—এই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা উপলক্ষে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে।

পৌরাণিকী কাহিনী বসুদেবকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মদাতা বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন, সাধারণ জীবের জন্ম যেমন তাহাদের পিতামাতার দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সেভাবে হয় নাই।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান আনক-দুন্দুভির বা বসুদেবের মনোমধ্যে আবিষ্ট হইলেন। "আনক দুন্দুভেঃ মন আবিবেশ।" শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মন আবিবেশ—মনস্যাবির্ব্বভূব, জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।" মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জীবদিগের জন্মে যেরূপ দেহসম্বন্ধ আছে, এখানে তাহা নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। সনাতনগোস্বামী বলিতেছেন—"বিশ্বান্তর্য্যামিতয়া সদা তস্মিন বর্ত্ত-মানোঽপি তদানীং তচ্চিত্তে ভাববিশেষেণ পর্য্যাঙ্কুরদিত্যর্থঃ"—বিশ্বান্ত-র্য্যামি বলিয়া ভগবান সর্ব্বদা সেই বিশ্বে বর্ত্তমান থাকিলেও, সেকালে ভাববিশেষরূপে বসুদেবের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিলেন, এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন বসুদেব মনোমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে ভাববিশেষ-রূপে লাভ করিলেন, দেবকীও সেইরূপ "মনস্তঃ দধার" মনোমধ্যে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। "মনস্ত দধার—মনসা দধার"—মনের দ্বারা ধারণ করিলেন, ইহাতে (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিতেছেন)

"জীবজননীজঠর সম্বন্ধো বারিতঃ"—জীবের জননীজঠর সম্বন্ধে বারিত হইয়াছে। শুকদেব আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

দেবী দেবকী ততস্তস্মাদানকদুন্দুভের্মনসঃ
সকাশাজ্জগন্মঙ্গলং ভগবন্তং শূরসুতেন সম্যগাহিতং
ধ্যানেনার্পিতং মনস্তঃ মনসোদধার।

অর্থাৎ "দেবকী জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেবের মন হইতে পাইলেন। কিরূপে? না বসুদেব ধ্যানযোগে দেবকীর মনেতে ভগবানকে স্থাপন করিলেন, দেবকী তাঁহাকে তখন মনোমধ্যে ধারণ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন; ভাববিশেষরূপে বসুদেবের অন্তরে স্ফুরিত হইলেন; আর দেবকী তাঁহাকে আপনার মনোমধ্যে গ্রহণ ও ধারণ করিলেন। বসুদেব আপনার মন হইতে এই শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর মনে ধ্যানযোগে অর্পণ করিলেন। ইহাই তিনি আপনার মনেতে ধারণ করিলেন। এই যদি ভাগবতের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের নররূপ মানস-বস্তু হইয়া যায় না কি? জড় পদার্থকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, দেহেতে ধারণ করি। জীবের উৎপত্তি যে বীজ হইতে হয়, তাহা তার পিতার দেহেতে, সেই দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই বীজ মাতা আপনার দেহেতে ধারণ করেন। মন হইতে খ-পুষ্পের বা নৃ-শৃঙ্গের মতন এবীজ উৎপন্ন হয় না, আর একটা শুদ্ধ মানসভাবরূপে মাতাও তাহাকে ধারণ করেন না। এই বীজেতে জীবের সাকুল্য, পরিপূর্ণ আকারটি লুকায়িত থাকে। তারই জন্য ঐ বীজের বিকাশে এই আকারের বা দেহের বা রূপের প্রকাশ হয়। বীজে যাহা নাই, জীবে তাহা প্রকাশ পায় না। বীজ যেখানে কেবল মানসবস্তু মাত্র, তার প্রকাশও সেখানে শুদ্ধ মানসবস্তু রূপেই সম্ভব হয়। মানসবস্তুকে চক্ষু দিয়া সাক্ষাৎভাবে দেখা যায় না, কাণ দিয়া তার কথা বা শব্দ শোনা যায় না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণের রূপও অতীন্দ্রিয় থাকিয়া যায়। ইহাতে অবতারের

কোনও অর্থ হয় না। এক্ষেত্রে অবতার মায়িক, ঐন্দ্রজালিক, কল্পিত, হইয়া পড়েন। অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমরা শঙ্করের "দেহবানিব জাত"তেই আসিয়া পড়ি।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ
আবিবেশাংশভাবেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১০ম-২-১৬।
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥
১০ম-২-১৮।

ভাগবতের এই দুই শ্লোকে ভগবানের জীবত্ব মাত্র বারিত হয়; কিন্তু যিনি "অকায়মব্রণমস্নাবিরং" কায়া শিরা ও ব্রণরহিত, তাঁর শিরা-ব্রণাদিযুক্ত কায়া কোথা হইতে, কিরূপে আসে, এই মূল প্রশ্নের কোনওই সমাধান হয় না। এ অবস্থায় তাঁর যে দেহের কথা বলা হইয়াছে, যে দেহধারণের দ্বারাই তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দেহকেও প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিধ দেহধর্ম্মশূন্য বলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ যাহাকে তাঁর দেহ বলিয়া দেখা যায়, তাহাতে অস্থি, পেশি, স্নায়ু, রক্ত, শিরা প্রভৃতি মানবদেহের প্রত্যঙ্গ বস্তু কিছুই নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এখানে তিনি "দেহবানিব দৃষ্টঃ" দেহীর মতন দেখান, এ ভিন্ন আর কিছুই বলা সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে তাঁহাকে একেবারে শরীরী বলা কঠিন হয়। কারণ জীবশরীর উৎপত্তি-বিনাশের অধীন। এই শরীর পূর্ব্বে ছিল না, একটা বিশেষ কালেতে তাহা জন্মে; জন্মিয়া তাহা বৃদ্ধি পায়; বাড়িয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। তারপর, এই দেহের সঙ্গে জীবের সুখদুঃখও জড়িত। এই সকল কারণে, ভগবানেতে দেহসম্বন্ধে ভাবিতে পারা যায় না। যদি বল যে জীবের দেহ জন্মমরণশীল হইলেও তার আত্মা ত অজ, নিত্য, শাশ্বত। গীতাতে ভগবানই ত ইহা বলিয়াছেন। জীবসম্বন্ধে দেহের অনিত্য-

ধর্ম্ম যখন তার আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে না ; ঈশ্বরসম্বন্ধে, তিনিই বা সত্য সত্যই দেহধারণ করিলে, তাঁর নিত্যত্বের, অব্যয়ত্বের, অজর-অমরত্বের ব্যাঘাত হইবে কেন ? তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। কারণ দেহী আত্মার নিত্যত্ব অসিদ্ধ না হইলেও, এই দেহেতে যতদিন আবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানের ও ভোগের যাবতীয় ক্রিয়া, এই দেহের ইন্দ্রিয়সকলের শক্তির ও স্বাস্থ্যের অধীন হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। জীবের দেহ আছে বলিয়াই সে জাগ্রত-সুষুপ্তি প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়। ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব। যদি বল যে জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবও ত দেহেতে থাকিয়াও দেহের গুণাগুণের দ্বারা আবদ্ধ হয় না ; ঈশ্বরের পক্ষে তবে দেহধারণ করিয়াও দেহধর্ম্মকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া থাকা ত কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তাহা হইলেও, সকল মীমাংসা হয় না। কারণ, জীবের দেহধারণ তার কর্ম্মের ফল। কর্ম্মফল ভোগের জন্য সে কর্ম্মোচিত দেহলাভ করে। ঈশ্বরের উপরে কর্ম্মের অধিকার নাই। সুতরাং দেহ-সৃষ্টির প্রয়োজন এবং উপাদান দু'ই তাঁর সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। যদি বল, আত্ম-প্রয়োজন ব্যতীতও শুদ্ধ লোকানুগ্রহার্থে তিনি দেহ স্বীকার করেন ; জীবন্মুক্ত মহাজনেরাও লোকহিতার্থে এরূপ ভাবে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই প্রশ্নই আসে,—জীবন্মুক্তেরা মুক্ত অবস্থাতেও ত এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম শরীরে বাস করেন। স্থূল সূক্ষ্ম কোনও শরীরই যদি তাঁহাদের না থাকে, তবে তাঁরা ত ব্রহ্ম-লয় প্রাপ্ত হন। জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মসত্তাতে মিশিয়া যান ; কেবল বিদেহী হইয়া নহে, নিতান্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যান। সে-অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় সংসার-প্রবাহে প্রবেশ করা ত একেবারেই অসম্ভব হয়। জীবন্মুক্তিতে সর্ব্বোপাধি একান্তভাবে নষ্ট হয় না। কৈবল্য মুক্তিতেই তাহা হয়। এই জন্য,—জীবন্মুক্তের লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বা চিৎ-দেহের আশ্রয়

থাকে বলিয়াই, তাঁরা কর্ম্মাধীন না হইয়াও, কেবলমাত্র লোকহিতার্থে দেহধারণ ও সংসারস্বীকার করিতে পারেন। ঐ লিঙ্গশরীর, বা সূক্ষ্ম-শরীর বা চিৎ-দেহ হইতেই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জীবদেহ গড়িয়া উঠে; শূন্য হইতে আসে না। অতএব জীবন্মুক্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের দেহধারণ সম্ভব এবং সঙ্গত, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, জীবন্মুক্তের যেমন লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বা চিৎ-শরীর ধরিয়া লওয়া হয়, ঈশ্বরেরও সেইরূপ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বা চিৎ-শরীর মানিয়া লইতেই হইবে। নতুবা অবতারবাদের সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না।

অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, ভগবদ্গীতা এসকল কথা মানিয়া লইয়াছেন। আর সপ্তম অধ্যায়ে যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে, তারই মধ্যে গীতার অবতারবাদের মূল চাবিটি পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে ভগবান যে দ্বিবিধা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই চতুর্থ অধ্যায়ে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া

বলিয়াছেন। এই প্রকৃতি স্বভাব নহে। এই প্রকৃতি কি, বারান্তরে তাহার তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গান

বসনের ভার সইতে নারি,
ঘুচাও হরি! আবরণ!
সকল অঙ্গে চাই যে পরশ,
ওগো আমার পরশ-রতন!
আজ আমারে লেংটা কর,
ওগো আমার প্রাণের ধন!
আমি সোহাগ নিব সোহাগ দিব,
ওগো আমার সোহাগ-রতন।
এই যে আমার রাঙা রাঙা
আঁচল-ঢাকা লাজের ফুল
দেয় যে বাধা প্রেমের পথে
হৃদয়ে আনে শতেক ভুল;
লওগো ছিঁড়ে প্রেমের ভরে,
ওগো আমার প্রেমের জন!
কিসের লজ্জা তোমার কাছে,
ওগো আমার লজ্জা-হরণ!
ঘুচাও সকল সাজ-সজ্জা,
সয়না আর ঢাকাঢাকি
হৃদয়ে মনে সকল অঙ্গে
হোক্‌না প্রেমে মাখামাখি;
লেংটা মনে লেংটা প্রাণে
দেওয়া নেওয়া মনের মতন!
ভাসা-ডোবা প্রেম-তরঙ্গে,
ওগো আমার হৃদয়-রমণ!

প্রাচীন কবির কবিতা

[কবি-কথা]

যে মহামনা সাহিত্যানুরাগী জমিদারের আগ্রহে ও যত্নে বঙ্গভাষায় প্রথম-নাটক "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" রচিত ও প্রকাশিত হয়, যাঁহার আগ্রহে স্বর্গীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" কাব্য রচিত হয়, সেই সাহিত্য-রসিক রংপুর-কাণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায়ের সহিত পরিচিত হইতে তদানীন্তন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু পথশ্রম স্বীকার করিয়া রংপুরে গিয়াছিলেন। বঙ্কিম-দীনবন্ধুর গুরু ঈশ্বরচন্দ্রকে পাইয়া কালীচন্দ্র হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। সেখানে গুপ্ত-কবিকে বন্ধু-স্নেহে বদ্ধ হইয়া কিছুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। সেই সময়কার ইতিহাস রাখিলে, কাব্য-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পত্তি হইতে পারিত, কিন্তু কেহ তাহা রাখে নাই। সে সকলই গিয়াছে। যাহাও আছে, তাহাও যাইতেছে। গত বৎসর শারদীয় অবকাশে কাশী-অবস্থান-কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ দিয়াছিলেন, চৈত্র মাসের "ভারতবর্ষ"পত্রে তাহা লিখিয়াছি। এই বৎসর পুনরায় দুইটি সংগ্রহ আমাকে দান করিয়াছেন। পণ্ডিতরাজের বাসস্থান—রংপুরে। তিনি কবি এবং কাব্যপ্রিয়। অনেক চেষ্টায় তিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, সস্নেহে আমাকে দিয়াছেন এবং দিতেছেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম স্নেহের ও উচ্চ-হৃদয়ের কথা সাহিত্যক্ষেত্রে আমি আমার অক্ষম রচনার সহিত উল্লেখ করিতে পারিয়া ধন্যজ্ঞান করিতেছি।

পণ্ডিতমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, কালীচন্দ্র কাব্যপ্রিয় ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে সকল সময়েই কবিতা রচনা করিয়া বন্ধুর প্রীতি উৎপাদন করিতেন।

রংপুর অঞ্চলে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা লোকের মুখে মুখে আবৃত্ত হয়। একটি উদাহরণ দিতেছি। কালীচন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাঁহার নাম কাশীচন্দ্র ; তাঁহাদের এক অমাত্য ছিল—সে ব্যক্তি খঞ্জ ছিল, তাহার নাম ভীমচন্দ্র। লোকে এখনো বলিয়া থাকে—

কাশী কালী এক জোড়া
মধ্যে মধ্যে ভীমে খোঁড়া।—ইত্যাদি।

স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইতেছে। মণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া প্রতিমা শোভা পাইতেছে। কালীচন্দ্র দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব করিলেন :—

ঢল ঢল সলিলে, কম্পিত অনিলে,
বিকশিত বিহসিত কমল।
শেফালী কত, নিপতিত শত শত
উত্থিত সৌরভ বিমল॥
নীল সুনির্ম্মল, বিপুল নভস্তল,
চারিদিকে নমি পড়িছে।
উড়ুগণ হীরক- ময় শত শত বক,
গগনতলে ঐ উড়িছে॥
উজলি ভবন মম, রূপ কি নিরুপম,
দর্শাইছ গিরিকন্যে।
দিব কি পদে তব, দান অসম্ভব,
তুমিই দিবে পদ ধন্যে॥
সকলি বিভব তব, বিধি, ভব, কেশব,
ভব চরণাম্বুজ সেবে।
শ্রীফলদল জল, লহ ফুল শতদল
আর কি অধমে দেবে?॥

ভক্তকবি জয়দেবের "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে"র—ছন্দে ইহা রচিত এবং পঠিতব্য। দীর্ঘে দীর্ঘ, হ্রস্বে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিলে, ইহা অতি সুন্দর ছন্দবন্দময় কবিতা হইবে। কবিতাটি পাঠ করিতে যে সময় লাগে, তন্মধ্যে উহা রচিত হইয়াছে, অথচ ইহার ভাব-ভাষা বুঝিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হইবে না।

কালীচন্দ্রের স্তব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে রচনা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন।—

বিকচ অতসী কুসুম- সম-সুকম-কান্তি এ
কনককুচকলসযুগ শোভে।
শত শত সহস্রমুখ পঞ্চমুখ ষন্মুখে (১)
চরণযুগ ভরিল মধুলোভে॥
চতুর চতুরানন কি চরণ সরসীরুহে
ঘুমিল বুঝি চরণ-মধুপানে।
ভরিল চরণাম্বুরুহ শত শত মধুব্রতে
সকলি হল মত্ত গুণগানে॥
দশভুজ ভুজঙ্গ তব ভূষিত দশায়ুধে
বিহর হরমহিষি হরি-পৃষ্ঠে। (২)
ভগবতী গণেশ গুহ কম্প্র কমলালয়া (৩)
তব সহ সরস্বতী তিষ্ঠে॥
শির উপরি পঞ্চমুখ মদন মথি রাজিছে
রজত গিরি-সদৃশ বরবেশে।
কনকরুচি গৌরতনু অতনু (৪) নত অঙ্ঘ্রিতে
পৃষ্ঠবুক আবরিত কেশে॥

---

(১) কার্ত্তিক। (২) সিংহ-পৃষ্ঠে। (৩) লক্ষ্মী।
(৪) মদন।

মণি রতন আভরণ গৌরতনু ঢাকিয়া
শোভিছে কি কব পরিপাটী।
কনককণ্ঠণ রত্নময় বিবিধ লতিকা ফুলে
খচিত তব গিরিশবধূ শাটী॥
জড়িত তড়িতে মুকুট মণি রতন কাঞ্চনে
রচিত তব শোভিছে মাথে।
যখনি তুমি মা দিলে চরণ ধরণীতলে
তখনি সব সুর (৫) উদিল সাথে॥
জ্বলদনলবর্ষি তব অরুণ তিন লোচন
স্ফুরিত অধরোষ্ঠযুগ হেরি।
ভয়চকিত দৈত্যকুল, তুমি কি করুণা দিতে
কারু'পরি কখন কর দেরি॥
বিকৃতিমতি কুকুরে দংশিলে ক্ষিপ্তজন
সলিল অবলোকি হয় ভীত।
তখনি তব চন্দ্রমুখ সস্মিত বিলোকিয়া
বিবুধগণ (৬) গায় গুণ গীত॥
বিকট মদমত্ত অরি সবল মহিষাসুরে
বিতরি পদ বিতর কি মহত্ব।
দনুজপতি যুদ্ধ করি লভিল গতি শাশ্বতী
মূঢ় বুঝিবে কি তব তত্ত্ব॥
জয় জননী হেমরুচি হৈমবতী তারিণি
স্নেহ করি বিতর পদরাজে।
যদি হয় কৃপা অসুর- উপরি তব শৈলজে
প্রথম বটি অসুরকুল-মাঝে॥

---

(৫) দেব। (৬) দেবগণ।

—ইহাও জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী"র—ছন্দে রচিত ও সেই সুরে পাঠ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা ভাব ও ভাষার অধিকারে দীন ছিলেন না। বরং তাঁহাদের ভাব ও ভাষা অতি সহজেই ফুটিত। এত সহজ, সরল ভাবের অভাব হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক অনেক কবির কবিতা সাধারণের তৃপ্তিকর হয় না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিতে প্রথম যে কয়ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "বাঙ্গালী কবির" জীবন-কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন—এই বিশ্বাসে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

অন্তর্বসন্ত

একি হাওয়া দুলে' দুলে' বহে প্রাণময় ;—
কূলে কূলে ভরা নদী কুলু কুলু বয়!
ভুবন-আঙ্গিনা জুড়ি' ঘাসের আসন
কে আজি বিছায়ে দিল! কুসুম-শয়ন
কে রচিল মরুসম দগ্ধ বন-শিরে!
আকুল মধুপ সেথা গুঞ্জরিয়া ফিরে ;
সপ্তমে তুলিয়া স্বর ডেকে মরে পিক,
ফাগুন কি এল ফিরি? হাসে চতুর্দ্দিক,
হাসে শ্যাম তৃণলতা, মুক্ত নীলাম্বর ;
আকুল পুলক-ভারে পূর্ণ এ অন্তর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২২ সাল

ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ প্রতিবৎসর মাঘোৎসবের সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, লোকে শাস্ত্রবাদী ও গুরুবাদী হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কেহ বা বলেন, বৈদান্তিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী ভাবুকতা আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ রোধ করিয়া বসিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ভিতরে নয়, বাহিরে। কিন্তু শাস্ত্র-বাদ বা গুরুবাদ এদেশে নূতন নহে। বৈদান্তিক বৈরাগ্য বা বৈষ্ণবী ভাবুকতাও আজিকার বস্তু নয়। ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্বেও এসকল এদেশে ছিল। যখন শিক্ষিত সমাজের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ছিল, তখনও এদেশ হইতে এসকল নির্ব্বাসিত হয় নাই। তবে সে সময়ে নব্যশিক্ষিত সমাজে এই শাস্ত্রবাদ বা গুরুবাদ, এই বৈরাগ্যের বা ভক্তির আদর্শের কোনওই প্রভাব ছিল না; আজ সে প্রভাব যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে,

তারই বা কারণ কি? ব্রাহ্মসমাজ এখন যেমন তখনও সেইরূপই এগুলিকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন; এখন যেমন তখনও সেইরূপ এগুলির ভ্রান্তি দেখাইয়াছিলেন। তখন লোকে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিত; ব্রাহ্মসমাজের মতবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; আজই বা তাহা করে না কেন? তখন এবং এখনের মাঝখানে অবশ্যই এমন কোনও না কোনও কিছু ঘটিয়াছে,—এমন কোন না কোনও প্রশ্ন উঠিয়াছে যার সন্তোষকর উত্তর এখনও ব্রাহ্মসমাজ দিয়া উঠিতে পারেন নাই; এমন কোনও নূতন অভাব জাগিয়াছে যাহা ব্রাহ্মসমাজ পূরণ করিতে পারিতেছেন না। এ যদি না হইবে, তাহা হইলে যে শিক্ষিত সমাজের চিন্তার ও আদর্শের উপরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের অমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ছিল, সেই শিক্ষিত সমাজের লোকে আজ শাস্ত্রবাদী ও গুরুবাদী, বৈদান্তিক মতের বা বৈষ্ণব আদর্শের অমন অনুরাগী হইয়া উঠিবে কেন?

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে হইলে যে ত্যাগস্বীকার করিতে হইত, আজ ত তাহা হয় না। তখন হিন্দু সমাজের যে শাসন ছিল, আজ তাহা নাই। তখন সমাজ-চ্যুতির যে অর্থ ও যে বিভীষিকা ছিল, আজ তার কিছুই নাই। একদিন ব্রাহ্ম হইলে লোকের ধোপা-নাপিত বন্ধ হইত; আজ ব্রাহ্মগণের ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ পাচক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন সমাজ হইতে তাড়িত হইবার যে ভয় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল, আজ তার কিছুই নাই। সমাজের শাসন-ভয়ে লোকে ব্রাহ্ম হয় না, এখন আর একথা বলা চলে না। শাস্ত্র না মানিলে বা গুরু গ্রহণ না করিলে, কেহ হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হয় না। সন্ন্যাসী-বৈরাগীর বা বৈষ্ণবের সম্মানই যে সমাজে হঠাৎ বাড়িয়া পড়িয়াছে, তাহাও ত নয়। তথাপি লোকে এখন কেন শাস্ত্রবাদ, গুরুবাদ, বৈদান্তিক বৈরাগ্যের বা বৈষ্ণবী ভাবুকতার প্রতি অমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, ইহা কি ধীরভাবে ভাবিবার

কথা নয়? নব্যশিক্ষিত সমাজ হইতে যাহা একদিন চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে বা আসিতেছে কেন? দণ্ডের বিভীষিকা বা পুরস্কারের প্রলোভন, দু'এর কিছুরই ত প্রভাব এখানে খুঁজিয়া পাই না। তবে এ প্রত্যাবর্ত্তন হইল কেন? অন্ধবিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থপর বা ভাবুক বলিয়া বিরোধীদলকে গালি-গালাজ করিলেই এ প্রত্যাবর্ত্তনের নিদান নির্ণয় হইবে না। নিজের দোষ না দেখিয়া, পরের ঘাড়ে এ দায় চাপাইলে ক্ষণিক আত্ম-প্রসাদ লাভ হইতে পারে, কিন্তু রোগের প্রতীকার হইবে না। এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ নিজের দায়িত্ব কতটা, ইহা আগে ধীর-চিত্তে নিরপেক্ষভাবে, আত্মপরীক্ষার দ্বারা ঠিক করুন। তার পরে দেশের লোকের ত্রুটিদুর্ব্বলতা কোথায়, কতটুকু, তাহার বিচার সহজে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি।

রাজা রামমোহনই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইলেও, রাজার প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব যখন হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, একরূপ তখন হইতেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ রাজাকে আধুনিক ভারতের নব-জীবনের ও নবীন সাধনার আদিগুরুরূপে বরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে হিন্দু-পুনরুত্থান ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হয়, বলিতে গেলে তাহারই মুখে, একরূপ তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, দেশের লোকে, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্টীয়ান্-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে, সকলে মিলিয়া রাজাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। আর তার পর হইতে প্রতিবৎসরই রাজার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি যেন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? অতীতের অপ-রাধ লোকে ভুলিয়া যায় বলিয়াই যে এরূপ হইতেছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিয়ৎপরিমাণে একথা সত্য হইলেও, এক্ষেত্রে কেবল এই একই কারণে যে দেশে রাজার প্রভাব বাড়িতেছে এমন বলা

যায় না। ইহার আরও নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। রাজার ব্রহ্মসভাতে আর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রভাব যে বাড়িতেছে, এই প্রভেদও ইহার একটা কারণ নয় কি?

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ কেবলই বিরোধ জাগাইয়াছে, কিন্তু সন্ধি ও সমন্বয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন একদিকে যেমন বিরোধ বাধাইয়াছিলেন, অন্যদিকে, তারই সঙ্গে সঙ্গে, আবার সেই বিরোধ-ভঞ্জন কোথায় এবং কিরূপে হইবে, তারও পথ দেখাইয়াছিলেন। এই জন্যই আজ লোকে তাঁর সন্ধি ও সমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাঁর প্রতিবাদকে হয় সত্য বলিয়া গ্রহণ, কিম্বা সাময়িক ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছে। আধুনিক কালে ভারতবর্ষের পক্ষে যে কাজটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য ছিল, রাজা তাহা করিতে গিয়াছিলেন। তারই জন্য আজ রাজার প্রতিপত্তি এত বেশী।

রাজার সমসাময়িক সমাজের অবস্থা।

রাজা রামমোহন হইতেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ; আর রাজার সমকালে দেশের চিন্তা ও সাধনার অবস্থা কি ছিল, লোকের তখন কিরূপ মতিগতি, সমাজে তখন কি অভাব জাগিয়াছিল, তারই দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কোন্ অভীষ্টসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে, ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। রাজার সময়ের কথা সাক্ষাৎভাবে সম্যক্‌রূপে আমরা কিছুই জানি না বলিলেও হয়। তবে রাজার নিজের পুস্তকাদি হইতেই সেকালের অবস্থার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া মনে হয় যে সে-সময়ে আমাদের হিন্দুসমাজ ঘোরতর তামস অবস্থায় পড়িয়াছিল। এখন যেমন ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে লোকের প্রাচীন মত ও সংস্কার বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, সে-সময়ে পার্শী ও আরবী

শিক্ষার প্রভাবে, অতটা পরিমাণে না হইলেও, শিক্ষিত লোকের মন যে স্বল্পবিস্তর সন্দেহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। রাজা নিজেই তার সাক্ষী। প্রচলিত হিন্দুদেববাদে রাজার অনাস্থা জন্মে বেদান্ত বা বাইবেল পড়িয়া নহে, কিন্তু পাটনায় পার্শী ও আরবী শিখিতে শিখিতে মোতাজেলা প্রভৃতি মোহম্মদীয় যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রাজার প্রথম প্রচারিত পুস্তক—তোহফাতুলই তার প্রমাণ। পার্শী ও আরবী পড়িয়া রাজার মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, অপরের মনে এই বিদ্যাপ্রভাবে যে তাহা জাগে নাই, এরূপ মনে করা অসম্ভব। পার্শী ও আরবী শিক্ষার ফলে, তখনকার ইল্‌ম্‌দার লোকের মনে যে নূতন নূতন জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, ইহা সচ্ছন্দেই ধরিয়া লইতে পারি। তবে রাজার চিত্তকে এই মোহম্মদীয় যুক্তি-বাদ যেপরিমাণে অধিকার করিয়াছিল, অপরের চিত্তকে সেপরিমাণে অধিকার করিতে পারে নাই, ইহাও সত্য। তাঁহারা মনে মনে অতি সন্তর্পণে যেসকল সন্দেহ ও অনাস্থা পোষণ করিতেছিলেন, রাজা তাহাকেই সর্ব্বসমক্ষে অকুতোভয়ে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজনেরা সকলেই এরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই জনমণ্ডলীর নিগূঢ় চিন্তা, ভাব ও ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, যাহা অসম্বদ্ধ ছিল তাহাকে সুসম্বদ্ধ করেন; যাহা কেবল আব-ছায়ার মতন ছিল তাহাকে সর্ব্বাঙ্গে প্রকট করিয়া তুলেন; যাহা অন্তঃসলীলার মতন ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত ছিল, তাহার জন্য প্রত্যক্ষ খাদ কাটিয়া দেন। লোকের মনে যাহা ছিল না, মহাপুরুষদের মনে তাহা শূন্য হইতে আসিয়া গজাইয়া উঠে না। ইঁহারাও নিজ নিজ কাল-শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগতে নব নব মত ও সিদ্ধান্ত, সাধন ও আদর্শের প্রচার করেন। (বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে লোকের মনে যে সকল ভাব বিন্দু বিন্দু করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাই যেন একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া বুদ্ধদেবের মধ্যে মূর্ত্তিমান

হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে,—ইহুদায়, গ্রীশে ও রোমে খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ও অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল ভাব লোকের মনে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাকেই কেন্দ্রীভূত ও প্রত্যক্ষ করিয়া যীশুখৃষ্টের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। অধুনাতন কালে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে বহুলোকের অন্তরে যে বৈষ্ণবী ভাব অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে ঘনীভূত করিয়াই মহাপ্রভুর অবতার হয়। দেশে যাহা নাই, মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা থাকে না। দেশে যাহা অস্ফুট, মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা প্রস্ফুট; দেশে যাহা মূক, মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা মুখর; দেশে যাহা নিরাকার ও অমূর্ত্ত ভাবরূপে বিদ্যমান থাকে, মহাপুরুষগণের মধ্যে তাহাই সাকার ও মূর্ত্তিমান হয়।

রাজা রামমোহনের সময়ে এবং তাঁর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেশে একটা নূতন জিজ্ঞাসা যে জাগিয়াছিল, রাজার নিজের জীবন ও প্রচারই তার সাক্ষী। আর এই জিজ্ঞাসার আশ্রয়েই রাজার তত্ত্বান্বেষণের সূচনা ও ক্রমে তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া বেশ বুঝা যায় যে সে-সময়ে লোকের মনে পুরাতন কিম্বদন্তী ও প্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি স্বল্পবিস্তর অনাস্থা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই অনাস্থাতে তখনও লোকের ধর্ম্মসাধনের বহিরঙ্গের ক্রিয়াকলাপাদিতে কোনও বিশেষ পার্থক্য জন্মাইতে পারে নাই। এদেশে বহুকাল হইতেই ধর্ম্মের দুইটা দিক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একটা সামাজিক, একটা ব্যক্তিগত; একটা বাহিরের আচার-আচরণের দিক, আর একটা ভিতরের সাধনভজনের দিক।) বাহিরে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন, ভিতরে তাঁহারাও অনেকে প্রকৃতপক্ষে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মেরই সাধনা করিতেন। (বহুতর তান্ত্রিক সাধকেরা এইরূপে বাহিরের প্রতীকোপাসনাতেও যোগদান করিতেন, আবার ভিতরে, নিজের অন্তরঙ্গ সাধনেতে, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" মন্ত্রের

সাধন এবং "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম", প্রভৃতি নামও জপ করিতেন। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধুমহান্ত ব্যতীত, আর কেহই প্রায় এই অন্তরঙ্গ সাধনের মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝিতেন না; যন্ত্রারূঢ়ের মতন এসকল নামজপাদি করিতেন মাত্র। এই সকল কারণে ধর্ম্ম প্রাণহীন, কর্ম্ম অর্থহীন, আচার শ্রদ্ধাহীন ও সিদ্ধান্ত বিচারহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার পরমার্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেন, কিন্তু শাস্ত্র জানিতেন না। সাধারণ লোকে গড্ডলিকা-প্রবাহের মতন তাঁহাদের অনুশাসন মানিয়া চলিত, কিন্তু কোনও কিছুরই অর্থ বুঝিত না। লোকের অন্তর্দৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পথ বাহ্যক্রিয়াকলাপাদির বাহুল্যে একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া আমরা সেকালের সমাজের এই চিত্রই প্রাপ্ত হই। আর এই ঘোরতর তামসিকতা, ইহসর্ব্বস্বতা, অজ্ঞানতা ও নির্জীবতা হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই রাজা একদিকে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রচার, অন্যদিকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ লইয়া প্রতিপক্ষীয়দিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের বীজ-স্বরূপ ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহেন, ধর্ম্মব্যাখ্যাতা মাত্র।

রাজাকে যীশু বা মোহম্মদ, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে দেখিলে চলিবে না। রাজা কোনও নূতন সাধন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। রাজা নিজে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক সাধনের মূল ব্রহ্মজ্ঞান। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এসকল তন্ত্র অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তান্ত্রিক সাধনে কোনও প্রকারের উৎকর্ষ বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্ম-

বুদ্ধিকেই চরম মুক্তি বলিয়া গিয়াছেন। রাজার নিজের সাধন এই তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন ছিল। তাঁর পুস্তকাদি পড়িয়া ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। আর যেমন সাধন-বিষয়ে রাজা কোনও নূতন পন্থার আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ কোনও একান্ত নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। এইজন্যই রাজাকে একটা নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, করিলে তাঁর কার্য্যের সত্যতা ও গুরুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়।

কিন্তু রাজা নূতন সাধন বা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত না করিলেও, তিনি যেকাজটি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব বা মর্য্যাদা সামান্য নহে। রাজা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। তিনি নূতনের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিন্তু পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি ও মনীষিগণ যেমন নিজ নিজ যুগসম্মত ব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, রাজাও তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই কাজই করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের খাত বহুবিধ সংস্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বহুবিধ কল্পনা-জালে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা সেই খাতের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে গভীর ও প্রশস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ধর্ম্মের বিকাশ-প্রণালী ও হিন্দুধর্ম্মের গতিশীলতা।

এইভাবে, প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্ব্বত্রই প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মসকল আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যুগে যুগে তত্তৎযুগের যুগসমস্যার মীমাংসা ও নব নব যুগপ্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ ভাবে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সমন্বয় ও সঙ্গতি না হইলে জগতের কোনও প্রাচীন ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। ফলতঃ

আমরা স্থূলদৃষ্টিতে এসকল প্রাচীন ধর্ম্মকে যতটা স্থবির মনে করি, তাহার কোনওটিই ততটা স্থবির নহে। আমরা বৈদিকধর্ম্মকেই আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের মূল মনে করিয়া থাকি; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঋগ্বেদের ধর্ম্মে আর আজিকার হিন্দুধর্ম্মে কত আকাশ-পাতাল-প্রভেদ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বেদের পরে উপনিষদ। এই উপনিষদের ধর্ম্মই কি আজিকার হিন্দু-ধর্ম্ম? উপনিষদের পরে পুরাণ। প্রাচীন পুরাণের ধর্ম্মই কি আজ অক্ষুণ্ণ আছে? যে মনুস্মৃতির দোহাই দেই, সেই স্মৃতিও ত সকল বিষয়ে আজ আর চলে না। অথচ সকলেই বেদস্মৃতিসদাচারকে ধর্ম্মের প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করেন। ইহার অর্থ এই নয় কি যে, বেদের অর্থ আজ আমরা আর সাক্ষাৎভাবে বেদের শব্দেতে অন্বেষণ করি না, বেদের আধুনিক ভাষ্যেই তাহা খুঁজিয়া থাকি। এই বেদভাষ্যেও বেদের সকল মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই। উপ-নিষদে, উপনিষদের ভাষ্যে; মহাভারতে ও ভগবদ্গীতাতে; মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি ও এই সকল প্রাচীন স্মৃতির আধুনিক ব্যাখ্যাতেই আমরা এখন বৈদিকধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া থাকি। এই বৈদিকধর্ম্ম একান্ত স্থবির ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, আজিও আমরা ইন্দ্রবরুণাদিরই পূজা করিতাম। আজিও যজ্ঞধূমে দেশ ছাইয়া থাকিত। আজিও নিয়োগাদি হীন-আচার সমাজে প্রচলিত থাকিত। উপনয়নাদি শ্রেষ্ঠতর সংস্কারও রঘুনন্দন-উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের নজীরে ত্রিরাত্রের ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয়ে আসিয়া শেষ হইত না এবং কেবলমাত্র বারকয়েক গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া, অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিবাহের যোগ্যতালাভ করিতে পারিত না। ফলতঃ শাস্ত্রানুগত্য ধর্ম্মের গতিকে কোথাও রোধ করে নাই বা করিতে পারে নাই, কেবল যোগ্যাযোগ্যনির্ব্বিশেষে প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রাকৃত বুদ্ধির অরাজকতা হইতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে যতই গতানু-

গতিক কিম্বা স্থবির মনে করি না কেন, শাস্ত্রগুরু মানিয়াও এই ধর্ম্ম বৈদিক সময় হইতে আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হাজার হাজার যুগ ধরিয়া যে একই আকারে ছিল, তাহা নহে। যুগে যুগে ইহার বহুতর পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন ঘটিয়াছে। প্রত্যেক সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাপন প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইহার নূতন নূতন অর্থ করিয়াছেন, নব নব পন্থার আবিষ্কার করিয়াছেন, অনেক অনুপযোগী প্রাচীন মতবাদ ও সাধন ও সংস্কারাদি বর্জ্জন করিয়াছেন, অপর ধর্ম্মের নিকট হইতেও বহুতর নূতন সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিয়া, এই প্রাচীন ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। প্রথমে যাহা একজন সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষে নিজের অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা দশজনে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার আবার নূতন শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এই সকল নূতন শাস্ত্র কালে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রাচীনের ন্যায় প্রামাণ্য-মর্য্যাদালাভ করিয়াছে। এইরূপে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুতর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এসকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মকে স্থবির বলা যায় কি?

কেবল হিন্দুধর্ম্ম নহে, জগতের কোনও প্রাচীন ধর্ম্মই বস্তুতঃ স্থবির ও গতিহীন হইয়া পড়িয়া নাই। খৃষ্টীয়ানেরা বাইবেলকে অতি প্রাকৃত ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানেন ও যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম খৃষ্টশতাব্দীতে এই বাইবেলের প্রতিষ্ঠাই হয় নাই; যাহাকে পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক বলে, তাহা যীশুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহুদা-সমাজে আপ্তবাক্যরূপে গৃহীত হইলেও, তখন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ানেরা তাহাকে নিজের করিয়া লয়েন নাই। তারপরে যখন বর্ত্তমান বাইবেল গড়িয়া উঠিল, তখন হইতেই কি খৃষ্টধর্ম্ম একভাবে পড়িয়া আছে? এই বাইবেলের উপরেই খৃষ্টীয়ান্ সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা আপনাপন প্রত্যক্ষ সাধনা-

ভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন নূতন মতবাদ এবং সাধন-পন্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজ নিজ অভিমত-অনুযায়ী বাইবেলের অর্থ করিয়া, খৃষ্টীয়ান-ধর্ম্মে কত কত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। আর এসকল কি খৃষ্টধর্ম্মের একান্ত স্থবিরতার পরিচয় দিয়া থাকে? অন্যদিকে সকল খৃষ্টীয়ানই যীশুখৃষ্টকে আপনার একমাত্র উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলের প্রাণগত সাধনের যীশু কি একই বস্তু? প্রাচীনকালে এলেক্জেণ্ড্রিয়ায় যে যীশুতত্ত্বের প্রচার হইয়াছিল, রোমের যীশুতত্ত্ব কি ঠিক তাহাই? আর তার পরে এই সতর-আঠার-শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টীয়ান্ সাধকদিগের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে যে যীশু বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তিনি কি প্রথম খৃষ্টশতাব্দীর সাধকদিগের যীশু? যীশু নাম রহিয়াছে, যীশুর ইতিহাস এবং কিম্বদন্তীও এই আঠার-উনিশ-শ বৎসরকাল প্রায় একই রহিয়াছে। কিন্তু যুগে যুগে খৃষ্টীয়ান্ সাধকদিগের ভিতরে এক এক নূতন যীশু-মূর্ত্তি ও যীশু-প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। একথা কি অস্বীকার করা যায়? আর এসকল বিচার করিলে, খৃষ্টধর্ম্মকেই কি একান্ত পরিবর্ত্তনবিমুখ ও স্থবির বলা যাইতে পারে? সূক্ষ্ম বিচারে জগতের কোনও প্রাচীন ধর্ম্মকেই স্থবির বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এসকল ধর্ম্মের নাম একই আছে। কিন্তু রূপ বদলাইয়া গিয়াছে ও প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে। শব্দ ঠিক তাহাই আছে। কিন্তু শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। আর এইভাবেই ধর্ম্মের নিত্যত্বের সঙ্গে তার অবশ্য-প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনাদির সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে। সাধকেরা ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বা যুগ-প্রবর্ত্তক মনীষা ও চিন্তানায়কগণ, যুগে যুগে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারাদির নব নব ব্যাখ্যা এবং পুরাতন শব্দে নূতন মর্ম্ম ও পুরাতন কর্ম্মে নূতন উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট করিয়া একই সঙ্গে ধর্ম্মধারাকে অপ্রতিহত রাখিয়া ধর্ম্মের বিকাশকে পরিচালিত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন আধুনিক ইংরাজ-শাসনাধীন ভারতে ঠিক এই কাজটিই করিয়াছিলেন। তিনি নূতন সিদ্ধান্তের বা সাধনের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিন্তু পুরাতন সিদ্ধান্ত ও সাধনকেই বর্ত্তমানের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, হিন্দুধর্ম্মের বা অন্য কোনও ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সনাতন সার্ব্বভৌমিকতাকে আকারিত করিয়াই যেন, সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতবাদীর ও সকল সাধনাবলম্বীর একটা সাধারণ সম্মিলন-ভূমিরূপে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজার কর্ম্মের মূল লক্ষ্য ও প্রকৃতি।

ইংরেজি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতেই রাজা বেদান্ত ও উপনিষদাদির মূল ও অনুবাদ প্রচার করিয়া এই ব্রহ্মসভার জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর "বেদান্তগ্রন্থ" প্রচারিত হয়। আর এই বৎসর হইতে ১৮২৭-২৮ পর্য্যন্ত রাজা যেসকল শাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার দ্বারাই তাঁর কার্য্যের লক্ষ্য ও মূল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই সকল প্রচার কার্য্যের দ্বারাই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতে তিনি কোন লক্ষ্য লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন, তার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আর এখানে প্রশ্ন উঠে—(১) রাজা পুরাতন শাস্ত্র প্রচার করিতে গেলেন কেন? জগতে যাহারা এ পর্য্যন্ত কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ত এরূপভাবে প্রাচীনশাস্ত্রের প্রচার করেন নাই। তাঁরা নিজেদের আদেশ ও উপদেশই প্রচার করিয়াছেন, কখনও বা প্রাচীন প্রবক্তাদের মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের পুণরুদ্ধার করিতে যান নাই। রাজা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মনকিউর ডি কনওযে সাহেবের মতন আপনার মনোমত শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া একটা Sacred Anthology.

কিম্বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতন উপনিষদের বুক্‌নী দিয়া একটা নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মতন একখানা নূতন শ্লোকসংগ্রহ প্রচার না করিয়া, গোটা বেদান্ত ও উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? (২) রাজা হিন্দু-শাস্ত্রের আর সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করিতে গেলেন কেন?—তিনি নিজে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর গুরু তান্ত্রিক মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু এ সত্বেও রাজা প্রথমে তন্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা না করিয়া বেদান্তের ও উপনিষদের প্রচার ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? আর উপনিষদের মধ্যেও তিনি ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৌষিতকী প্রভৃতিকে বাদ দিয়া, সকলের আগে কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানির প্রচারে ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? কুলার্ণব-তন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম উল্লাসের মূল, রাজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এই তন্ত্র কোন্ সময়ে প্রচার করেন, তাহা জানা নাই। আর যে সময়েই প্রচার করুন না কেন, এই তন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে, রাজার প্রকাশিত গ্রন্থে ইহার যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই উপদেশ আছে। এই তন্ত্রের সঙ্গে কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে কারণে রাজা বেদান্ত ও কেন, কঠ প্রভৃতি উপ-নিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, সেই কারণেই কুলার্ণব-তন্ত্রের এই অংশেরও প্রচার করেন। প্রশ্ন এই—এই কারণটি কি?

শাস্ত্রপ্রামাণ্য বিষয়ে রাজার মত ও তাঁহার মীমাংসা-প্রণালী।

রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ শাস্ত্রপ্রামাণ্য অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজা শাস্ত্র মানিতেন। আর তিনি কেবল বেদকেই একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন, এমনও বলা যায় না;